স্বপ্নের নিচে দাঁড়িয়ে

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

মৌসুমী প্রকাশনী। কলকাতা-৯

প্রকাশকাল :
শ্রাবণ : ১৩৭২

প্রকাশক :
দেবকুমার বসু
মৌসুমী প্রকাশনী
১এ কলেজ রো
কলকাতা-৯

মুদ্রক :
মধু ঘোষ
প্রসাদ প্রিণ্টার্স
৪১, শঙ্কর ঘোষ লেন

প্রচ্ছদ-শিল্পী : গৌতম রায়

শ্রদ্ধেয় অরুণ বাগ্‌চী

করকমলেষু ॥

বুলি তার বরের সঙ্গে আবুধাবি চলে গেলে বাড়ি নিঃঝুম হয়ে আছে সাবাটা দিন। বড় বোন রাণু একবার ভাঙা দেউড়ির কাছে কাঠমল্লিকা গাছের তলায়, একবার খিড়কির দিকে ছোট্ট পুকুরের পাড়ে এবং তার যত্নে সাজানো বাগানে উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়িয়েছে। দুপুরে ভাল করে খায়ওনি। ঘরে চুপচাপ শুয়ে চোখ রেখেছে বুলি আব তার ববেব ছবিতে। স্যুট পরা বরের নাকটা একটু মোটা। গোঁফ ইসমাইল কোচোয়ানের মতো। বুলি কি এমন বব চেয়েছিল? রাণু বিশ্বাস করতে পারে না। ছোট বোনটিকে সে অনেক দিক থেকে নিজের মনের আদলে গড়ে তুলেছিল। সে নিজে যা হতে পাবে না, হতে চেয়েছিল, সেইরকম কবে। সেজন্যই বড় কষ্ট হচ্ছে রাণুর।

বর থাকে আবুধাবিতে। সে তো মরুভূমির দেশ। আকাশ নরম করে মেঘ ভাসে কি? ঝিরঝিরিয়ে বৃষ্টি ঝরে কি সে দেশে? চোখে হয়তো মেখে যায় সারাক্ষণ ধু ধু রুক্ষতা। রাণু দেখতে পায়, চারদিকে ক্ষয়াখর্বুটে কাঁটাঝোপে উটের কুৎসিত মুখ আর কষায় রক্ত। রাণু ভাবে বুলির বড় কষ্ট হবে। কাবণ সে গাছপালা ভালবাসত। ভালবাসত একবুক জলে ভরা নদী। প্রতি বছর শরতে নৌকো ভাড়া করে বুলিরই তাগিদে বড় বোন রাণু সেই বহরমপুর অব্দি গেছে, ফিরেছে সদলবলে রাতদুপুরে। নৌকোয় মাইকে গান বেজেছে। রাঁধাবাড়া হয়েছে। খাওয়াদাওয়ার পর হ্যাসাগবাতি নিভিয়ে নিজেরা গান গেয়েছে। বুলির গলা কী মিষ্টি। ফাংশানে ইদানিং তার ডাক পড়ত। রাণুর সামনে মাসে নজরুল জয়ন্তী করার ইচ্ছে ছিল নিজের স্কুলে। সে ইচ্ছে বুলির চলে যাওয়ার তলায় চাপা পড়ে গেছে। বুলির বর বলেছে, গাইতে অসুবিধে নেই। ওখানেও বাঙালী ক্লাব আছে। মিউজিক্যাল ইন্সট্রুমেণ্টস কিনে দেব।

ছোট বোনের বরকে মোটেও পছন্দ হয়নি রাণুর। কালো কুচকুচে রঙ, কোচোয়ানের গোঁফ, থ্যাবড়া নাক। তার নাকি এয়ারকণ্ডিশনড কোয়ার্টার আছে। মার্সেডিস গাড়ি আছে। ফ্রিজ ভরা ফল আছে। মেঝেয় পা-ডুবে-যাওয়া রঙীন কার্পেট আছে। হাই-ফাই রেকর্ডপ্লেয়ার আছে। কালার টিভি আছে। হেন আছে, তেন আছে।

হাতি আছে। ঘোড়া আছে। আব্বার বুড়ো বয়সে ভীমরতি ধরেছিল। টুকটুকে সুন্দর মেয়েটাকে কোচোয়ানগোছের লোকটার গলায় ঝুলিয়ে দিলেন। আর সেই নিয়ে তাঁর মুখ খুলে গিয়েছিল কিছুদিন থেকে। স্টেশন থেকে বাজার, বাজার থেকে ঘাটের মাথায় পাটোয়ারজীর গদী, হাজার জায়গায় খালি জামাইয়ের কথা। বর্ধমানের খানদানী ঘরের ছেলে গো। আমাদের মতোই কপালের ফেরে গরিব হয়ে পড়েছিল। নিজের চেষ্টায় ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছে দুর্গাপুর থেকে। অনেকদিন হাড্ডা-গড্ডা খেয়ে বেড়িয়েছে এ ঘাট সে ঘাট। আজকাল যা চাকরির বাজার। শেষে তোমার গে আবুধাবিতে গিয়ে খুব উন্নতি করেছে। এখানকার কারেন্সিতে হিসেব করলে তা হাজার বারো স্যালারি। ওদেশে ইঞ্জিনিয়ারের খুব কদর, বুঝলে তো?

রাণুর মনে গোড়া থেকেই একটা কিন্তু থেকে গেছে। মায়ের কাছে বরের বয়সের কথা তুলে কুৎসিত একটা ধমক খেয়েছিল। মা বেজায় বদরাগী মহিলা। অনেক রকম রোগে ভোগেন। কথাটা শুনে রাণুর চোখে জল এসে গিয়েছিল। তুমি আমাকে তাই ভাবলে মা? আমি হিংসেয় জ্বলছি? বুলিকে আমি হিংসে করি?

জোহরার মাঝেসাঝে যেন বুদ্ধিসুদ্ধি হারিয়ে যায়। বুলি টানতে টানতে বড় বোনকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তুই তো জানিস, আমাদের মা কেমন মানুষ। কেন ওসব বলতে যাস?

বুলি, তুই কি ভাবিস আমি তোকে হিংসে করছি?

বুলি তুহাতে ওকে জড়িয়ে ধরে বুকে মুখ ঘষে ফিস ফিস করে বলেছিল, আমি জানি, আমি জানি। তুই কতো ভাল। কতো লক্ষ্মী মেয়ে। তুই আমার সোনার আপা (দিদি)।

বুলি জানে, বড় মেয়ে রাণুর জন্যই বর খুঁজছিলেন কাজিসায়েব। কলকাতার তালতলায় থাকেন এখানকার এক অ্যাডভোকেট। তিনিই ঘটকালি করেছেন এ বিয়েতে। তিনি নাকি বরের দূর সম্পর্কের মামু। বুলিকে তিনিই পছন্দ করেছি'লন। অগত্যা সায় দিতে হয়েছিল কাজিসায়েবকে। আজকাল ববপণের যুগ এসেছে। রাণুব জন্যে এক গণ্ডগ্রামের স্কুল ফাইনাল পাশ প্রাথমিক শিক্ষক আঠাবো হাজার নগদ চেয়েছিল। এরকম অনেক জায়গায় ঘা খেয়ে এই অবস্থা। রাণুর বয়স তিরিশ হয়ে এল ভেতবে ভেতরে। তাকে দেখতে এসে সবাই বরাবর বুলিকেই পছন্দ কবে গেছে। রাণু জানে, তবু বুলির বিয়ে না হওয়ার কারণ বরপণের টাকাকড়ি আর দামী জিনিসপত্র দেওয়ার সাধ্য ছিল না কাজিসায়েবের। আবু-ধাবিব শাহাবুদ্দিন বুলিকে উদ্ধাব করেছে।

মেজটি ছেলে। তু'বছরের ছোট রাণুব চেয়ে। এখন পারুল ট্রান্সপোর্টে ট্রাক ড্রাইভারি করে। বড বোনের মুখ চেয়ে নাজিম এখনও বিয়ে করেনি। সে এ বাড়িতে অন্য ধাতুর ছেলে। তুর্দান্ত গোঁয়ার এবং মারকুট্টে। ক্লাস নাইনে পড়া ছেড়ে নানা ধান্দায় ঘুরত। রাণুর কিন্তু ছাত্রী হিসেবে মেধা ছিল। বি এ পাশ করে একটা মাস্টাবি জুটিয়েছিল এখানকার মেয়েদের স্কুলে। তারপর প্রাইভেটে বাংলায় এম এ দিয়ে বি টিও পড়ে নিয়েছে। এখন এ্যাসিস্ট্যানট হেড মিসট্রেস। আর বুলির তত কিছু মেধা ছিল না পড়াশোনায়—যতটা ছিল গানে, নাচে, একটু আধটু অভিনয়েও। টেনেটুনে বি এ-টা পাশ করেছিল গত বছর। এখন তার বয়স তেইশ। খুব হঠাৎ এবং ঝটপট বিয়েটা হয়ে যায় গত অঘ্রাণে। তখন বরেব অনেক অসুবিধে ছিল। ছুটিছ টা, বউয়ের জন্যে পাস-পোর্ট ভিসার সমস্যা ছিল। পাঁচ মাস পরে এসে আবুধাবির

ইঞ্জিনিয়ার বর তাকে নিয়ে গেল। বুলি এই প্রথম প্লেনে চাপবে। রাণুর মাথার ভেতর সেই ধূসর প্লেন চাপা গরগর শব্দে উড়ে চলেছে। আরবের মরভূমি থেকে এক কালো দৈত্য এসে ফুটফুটে কচি মেয়েটাকে তুলে নিয়ে ভেসে গেল আকাশ পেরিয়ে।

বাইরে হঠাৎ ভট্‌ভট্‌ বিশ্রী আওয়াজ উঠল। জোহরা বেগমের গলা শোনা গেল। এই অবেলায় আবার কোথায় চললে?

যাই। একবার সেখপাড়া ঘুরে আসি। মোমিনের বউটা ভুগছে। মবিন কাজি বললেন। ...ইয়ে, রাণু বুঝি শুয়ে আছে?

জোহরা কী বললেন শোনা গেল না। কাজিসায়েব আগে সাইকেলে করেই ঘুরতেন রুগী দেখে। ছোট মেয়ের বিয়ের পর জামাই শ্বশুরকে কিছু ডলার পাঠিয়েছিল। লিখেছিল: আব্বাজানের পক্ষে এ বয়সে সাইকেলে খুব তকলিফ হয়। তিনি একটা স্কুটার কিনুন, ইহাই আমার অভিপ্রায়।

কী বাংলা লেখার ছিরি! রাণুর পক্ষে হাসি শোভন নয়। বুলিকেও এ নিয়ে কিছু বলা ঠিক নয়। মনে মনে খুব হেসেছিল রাণু। কলকাতায় সেই অ্যাডভোকেট মজিদ সায়েবের বাসায় তিন দিন থেকে স্কুটার কিনে বাসে বাড়ি ফিরেছিলেন মবিনকাজি। তবে তাঁর অনেক ব্যাপারে সহজাত দক্ষতা আছে। ছেলে নাজিমের অনেক চেলাচামুণ্ডা আছে। স্কুলের মাঠে বুড়ো বাপকে স্কুটারে চাপা শেখাতে তার লজ্জাবশতঃ অনিচ্ছা। তাই ওই ব্যবস্থা। কিন্তু সবাইকে তাজ্জব করে কাজিসায়েব দুদিনেই স্কুটারটাকে শায়েস্তা করেছিলেন।

স্কুটারটার গড়ন অদ্ভুত। রাজহাঁসের মতো দেখতে। সাদা রঙ। আর কাজিসায়েবের রুগীবাড়ি যাওয়া পোশাকটিও অদ্ভুত। হলদে রঙের কতকালের পুরনো আচকান, গোড়ালির ওপর অব্দি আঁটো পাজামা, পায়ে জীর্ণ বুট। কিন্তু মাথায় চাপানো নতুন হেলমেট—সাদা রঙের। এসব কলকব্জার গাড়ি চাপতে হলে এটাই দস্তুর। ঘোড়ায় চাপলে জিন এবং চাবুক চাই যেমন। উপমা

সঠিক নয়, কিন্তু এটাই কাজিসায়েবের যুক্তি। শেষে বলেন, আজ-কাল আইন হয়েছে যে!

স্কুটারের শব্দটা বাইরের চত্বর থেকে ভাঙা দেউড়ি হয়ে মিলিয়ে গেল। বুলির বিয়ের পর মবিন কাজির চালচলনে যৌবন ফিরে এসে ঠিকরে পড়ছে যেন। সবসময় চঞ্চল, অনর্গল কথাবার্তা, পুরনো জীর্ণ এই একতালা বাড়িটা মেরামতের স্বপ্ন। কথাবার্তা রাণুর সঙ্গেই বেশী বলতে চান। রাণু বুঝতে পারে, আব্বা তাকে এক ধরনের সান্ত্বনা দিতে চান। কী দরকার? রাণু কি বিয়ের স্বপ্ন দেখেছে কোনোদিন? সে নিজেকে এতদিনে মোটামুটি জেনে ফেলেছে। কারুর রান্নাঘরে হাঁড়ি ঠেলতে কিংবা ছেলেপুলের জন্ম দিতে সে পৃথিবীতে আসেনি। বুলি যতদিন পাশে ছিল, সে একলা থাকার কথাটাও মাথায় আনেনি। বুলি চলে গেলে এখন সেই একলা হয়ে পড়ার অস্বস্তিটা তাকে ঠেসে ধরেছে। কিন্তু কে এটা ঘোচাতে পারবে? অন্তত কোন পুরুষমানুষ তো নয়ই, রাণু দিব্যি কেটে তা বলতে পারে।

ক'দিন আগে খুব ঝড়বৃষ্টি গেছে। আবহাওয়ায় এখনও ঠাণ্ডা কোমল একটা ভাব রয়ে গেছে। বিকেলের রোদকে কনেবউয়ের মতো—বুলির মতো লাজুক মনে হয় রাণুর। জানলার নিচে পুকুরের জলটা ঘন সবুজ দামে ঢাকা। তার ওপর বাঁশপাতা ভাসছে। চোখে লেপ্টে যায় সবুজটা। ওধারে বাঁশবন। অজস্র গাছগাছালি জুড়ে বৃষ্টি খাওয়া জোবালো প্রকৃতির সঙ্গে কনেবউটি হয়ে রোদটা হাসাহাসি করছে। প্যাঁক প্যাঁক করে হাঁস ডাকছে। একটা করে দিন চলে যাবে এইসব বিকেল, রোদ, পাখ-পাখালির ডাক, পতপত করে ঝরতে থাকা হলুদ বাঁশপাতার ঝাঁক, বাছুরের হাম্বা, গাইগরুর গলার ঘণ্টাধ্বনি ফেলে রেখে। রাণুকেও ফেলে রেখে যাবে এই নিঃঝুম পুরনো বাড়ির জানলায়। ওদিকে মরুভূমির দেশে দেড়শো ফুট চওড়া মসৃণ পথে বুলি বসে থাকবে মারসেডিস গাড়িতে। ঘণ্টায় আশি মাইল

গতি। পাশে এক কালো দৈত্য। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটেছে।

আমি কি হিংসে করছি? ছিঃ, ওকথা কেন? বুলি সুখে থাক। খুব কষ্ট পেয়েছে জীবনে। হোমিওপ্যাথি ডাক্তারের মেয়ে! তার বাবাকে কে-ই বা ডাক্তার বলে? সবাই বলে কাজিসায়েব। খানবাহাদুরের ছেলে। ভাঙা দেউড়ির দুটো থাম এখনও দাঁড়িয়ে আছে করুণ মুখে ভিখিরির মতো। একটা থামের গায়ে একটুকরো ভাঙাচোরা মারবেল ফলকের লেখা সুন্দর হরফের 'সন্ধ্যানীড়' ঘিরে শ্যাওলা, ছত্রাক, আমরুল চারা থকথক করছে। প্রকৃতির উদাসীন পাঞ্জা পড়েছে গায়ে। দেউড়ির মাথায় দাদীবুড়ির মতো কাঠ-মল্লিকার গাছটা শুধু কিছু স্নেহ বিলায় ফুল ফুটিয়ে। গন্ধে মউমউ করে সারাক্ষণ। এ পাড়ায় বিদ্যুৎ এখনও আসেনি। বুলি একবার অন্ধকারে ওখানে একটা সাদা পোশাকপরা জিন দেখে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। তখন বয়সই বা কত? দশ টশ হবে। রাণু জিনপরী ভূতপ্রেতে বিশ্বাস করে না। কাঠমল্লিকার গাছে অনেক রাতে একটা রোগা হনুমানকে দেখে যদিও বাড়িতে হইচই ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু বুলি হলে কী করত? বুলির বর বলেছে, একটু স্মার্ট করে নিতে হবে। ইংলিশ স্পিকিং পাওয়ার বাড়াতে হবে। ফারদার পড়াশুনার ব্যবস্থাও করব। সায়েনস থাকলে ভাল হত।

টেকনলজিক্যাল কোনো লাইনে ঢুকিয়ে দিতাম। দেখা যাক। অনেক স্কোপ ওখানে তবে কি জানেন আব্বা, খাওয়াদাওয়ার বড় সুখ। নির্ভেজাল ফুডস। অঢেল ফল, গোশত, যত চান। চোখের সামনে দেখলাম হাড়জিরজিরে হয়ে এল। দু'মাসের মধ্যে ফুলে ঢোল। গাড়িতে জায়গা হয় না।

কালো দৈত্যটি রসিকও বটে। বুলুর শরীর একটু রোগাটে। রাণু যদি বা গায়েগতরে একটু আছে, বুলির কিচ্ছু নেই। বুলি যদি স্বাস্থ্যবতী হয়ে ওঠে, রাণুর কী যে ভাল লাগবে। কিন্তু দৈত্যটি কি সত্যি কথা বলছে? রাণু জানে না, কেন এখনও ওকে বিশ্বাস

করতে পারছে না। এই যে বুলি চলে গেছে ওর সঙ্গে, খালি মনে হচ্ছে, আরবের সেখদের কাছে বেচে দেবে না তো? এমন খবর তো আজকাল কাগজে বেরোয়।

অ রাণু! অবেলায় ঘুমোবি, না উঠে চা-ফা খাবি? মায়ের ডাকে রাণু উঠে বসল। একরাশ কালো কোঁকড়ানো চুল বেঁধে আলতোভাবে আঁচলে দ্রুত মুখ মুছে নিতে নিতে রাণু সাড়া দিল, যাই! তারপর ড্রেসিং টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। গত বছর এ্যাসিস্ট্যানট হেডমিসট্রেস হবার পর আয়নাটা কিনেছিল রাণু। নাজিম গঙ্গায় স্নান করে এসে বড় বড় চুল আঁচড়াতে গিয়ে ময়লা জলের ছাট পড়ত। রাণু মনে মনে চটলেও ভাইকে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না। বুলি কিন্তু খাতির করত না বড় বলে। সেই থেকে নাজিম আর বোনদের ঘরে চুল আঁচড়াতে বা দাড়ি কাটতে আসা ছেড়েছিল। ড্রাইভারি পেয়ে সে আর একটা এইরকম আয়না কিনে ফেলত প্রায়। কেনেনি। রাণুকে বলেছিল, তোর আয়নাসুদ্ধ তোকে বিদায় করে তবে না কিনব! এখন বেশ তো চলে যাচ্ছে শালা। আমার আবদুল চাচা বেঁচে থাক। জানিস রাণু! আবদুল চাচার পানের দোকানে যে গোল আয়নাটা আছে, তার বেলজিয়াম কাচ? নাজিম এখনও বারান্দার থামের গায়ে মায়ের সেকেলে ছোট্ট আয়না পেরেকে ঝুলিয়ে দাড়ি কাটে। আর তাই দেখে বুলুর বর তাকে চমৎকার একটা সেফটি রেজার আর একগুচ্ছের ব্লেড দিয়ে গেছে। নিজেরটাই। বলে গেছে, ফের যখন আসব, তখন যেন ইলেকট্রিসিটি নিয়েছ দেখতে পাই। ইলেকট্রিক শেভিং-সেট এনে দেব।

আয়নায় নিজেকে খুঁটিয়ে দেখছিল রাণু। একটা জানলা দিয়ে গলিয়ে এসেছে ফিকে গোলাপী কয়েক ফালি রোদ। জানলায় কাঠমল্লিকার পাতার ছায়া কাঁপছে। ঘরে ঝরঝরে আলো। এবেলা প্রতিবিম্ব খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে রোজ। আচ্ছা, আমার কি সত্যি ততকিছু বয়স হয়েছে? চোখের তলায় হালকা অমন ছোপ তো

বুলিরও আছে। বেশি রকমই আছে। আমার গায়ের রঙটা অত ফর্সা না। আমি নাকি আব্বার মতো। আর বুলি হচ্ছে অবিকল মায়ের মতো। বুলিকে মেয়েরা ফিল্ম স্টারদের নাম ধরে আদর করে। আমিও তো কতবার ডেকেছি ওইসব নামে। কিন্তু আয়নার ভেতর দাঁড়িয়ে থাকা ওই মেয়েটিকে দেখে কি কুৎসিত মনে হয়? আমার মাথায় এত চুল। ঘন কালো কোঁকড়ানো এত চুল দেখে সবাই আমায় হিংসে করে। আমার গালে কয়েকটা ব্রণের দাগ আছে। চেষ্টা করলে ওগুলো হয়তো মুছে দিতে পারতাম। আমার কেমন আলসেমি লাগে এসবে—সেজেগুজে থাকা, রঙচঙ মাখা, নিজের শরীরের দিকে সারাক্ষণ চোখ রেখে চলা অসম্ভব, ভীষণ অসম্ভব, আর অবান্তর আমার কাছে।

সেবার স্কুলের রবীন্দ্র-জয়ন্তীতে চুলে একটা সাদা ফুল গুঁজে দিয়ে রমলা বলেছিল, তোমায় কী সুন্দর দেখাচ্ছে রাণুদি! ক্লাস টেনের ওই মেয়েটা আমার জীবনে সেই প্রথম আমাকে সুন্দর বলে প্রশংসা করল। টেস্টে ওর বাংলার খাতায় প্রাণভরে নম্বর দিয়েছিলাম—না, অত কিছু তলিয়ে না দেখেই যেন অবচেতন খুশিতে। পরে মনে হয়েছিল, তাই তো! এটা ঠিক হয়নি। রমলা এখন কলেজে পড়ছে। মাঝে মাঝে হুট করে চলে আসে কখনও। এত কথা অত কথা বলে। তাকে নিয়ে বাগানে যাই। বাগানে কত ফুল ফুটিয়েছি ছোটবেলা থেকে। মেয়েটা যদি একবার ফের চুলে ফুল গুঁজে দিয়ে বলত, তোমায় কী সুন্দর দেখাচ্ছে রাণুদি! কিন্তু না। আমি তেমন মেয়ে নই যে যেচে কারুর প্রশস্তি শুনব।

রাণু ভারি নিঃশ্বাস ফেলল। আশ্চর্য, বুলি আমাকে কখনও বলেনি, আপা, তোকে কী সুন্দর দেখাচ্ছে রে! কতবার ওর সামনে শাড়ি পরেছি, চুল আঁচড়েছি—তবুও। বুলির চেয়ে আমার ঠোঁট দুটো কেন যেন ফর্সা, একটু লালচে আর পাতলা। বুলির ঠোঁট দেখে মেয়েরা বলে, তুই লুকিয়ে মঞ্জুর মত সিগারেট খাস নাকি রে? বুলি প্রায় কাঁদতে বাকি। অথচ কেউ তো বলে না, রাণুদি কী

সুন্দর পাতলা টুকটুকে ঠোঁট তোমার! কেউ কেন বলে না, রাণুদি, তোমার গাল দুটো কী নিটোল! আমার ঠোঁটের তলায় একটা তিল আছে। দারুণ স্পষ্ট এক তিল। বি. টি. পড়ার সময় হোসটেলে তাই নিয়ে সবাই হাসাহাসি করত। বলত, কোকশাস্ত্র পড়েছেন রাণুদি? ঠোঁটের তলায় অমন তিল থাকলে সে ভীষণ কামুক হয়।···

রাণু! অ রাণু! চা খাবি না নর্দমায় ঢেলে দেব? জোহরা বেগম চটে গেছেন। গলা চড়িয়ে ডাকছিলেন।

রাণু সাড়া দিল আস্তে। যাচ্ছি।···

উঠোনে গাঢ় ছায়া পড়েছে। ইদারার ধারে আস্তে সুস্থে ময়নার মা রাজ্যের থালা হাঁড়ি পেয়ালা ছত্রখান করে ধোয়াপালা করছে। বাড়িতে জামাই আসার পরিণাম। তবে এ আর কী! ময়নার মা খান বাহাদুরের আমলের জমজমাট গেরস্থালি দেখেছে। এপাশে-ওপাশে কত ঘর ছিল। সব চোখের সামনে ভেঙেচুরে গেল। মবিন কাজির আরও তিন ভাই ছিলেন। দেশ ভাগের আগে পরে তারা পাকিস্তানে চলে যান। তারা তিনজনেই বড় চাকুরে। নানা জায়গায় থাকতেন। বাড়িটা ভাগাভাগি করে বেচে দিয়ে যান নিজের নিজের হিস্যা। যারা কিনেছিলেন, তারা বাস করার জন্যে কেনেননি। ইট কাঠ লোহালক্কড় ট্রাক বোঝাই করে নিয়ে গেছেন। আগাছার জঙ্গলে কিছু ঢিবি ছাড়া পঁচিশ বছর আগের কোন স্মৃতি প্রকৃতিতে টিঁকে নেই। বড় ভাই মবিন কাজি ম্যাট্রিকটাও পাশ করেননি। কিছুটা উড়নচণ্ডী স্বভাবের মানুষ। তার ওপর কংগ্রেস করতেন বলে এলাকার মুসলিম বড় মানুষদের চক্ষুশূল ছিলেন। বিঘে পাঁচেক ধানজমি, একটা বড় পুকুরের সিকিভাগ, এই মোট সম্পত্তি। হোমিওপ্যাথি করে সংসারের ফুটো মেরামত করেছেন সারাজীবন। কিন্তু তাতেও তেমন পসার হয়নি। শরীকদের অংশ কিনে নেওয়ার সাধ্য তাঁর ছিল না। আর ভাইরাও তো পয়সাওলা মানুষ, মুখ ফুটে বলতে পারেনি, ভাইজান, এ গুলো আপনিই এ্যাদ্দিন দেখা-

গুনা করেছেন, আপনিই খান। অভিমানী মবিন কাজি পয়সা থাকলেও কি কিনতেন? অন্তত মুখে তাই বলেন।

তবে ভাইদের দেখে ঠকেই শিখেছিলেন ডিগ্রির কতটা দাম। সেই দুঃখই তাকে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখবার জন্য জীবনপণ করিয়েছিল। নাজিম পারল না। খুব ঠেঙিয়ে রক্তারক্তি করেছিলেন। উল্টে নাজিম আরও বিগড়ে গিয়েছিল। শুধু মেয়ে দুটো তার মুখ রেখেছে। এতেই উনি গর্বিত। মুখ তুলে হাঁটেন। তার ওপর বুলির এমন বর জোটাতে পেরে মবিন কাজির মনে অনেক শান্তি এসেছে। জোহরা যদি রাণুর বিয়ের কথা তোলেন, কাজিসাহেব হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলেন, রাণু কি কারুর ভরসা করে? রাণু কি ভাবছ এম এ বি টি পাশ করে কারুর হাঁড়ি ঠেলতে যাবে? ও সে মেয়ে নয়। জোহরা বাঁকা মুখে বলেন, না। তোমার বেটির কপালে ব্যারিস্টার-ম্যাজিস্ট্রেট জুটবে, ওই আশায় থাকো। গিয়েছিলে তো একটা চাষার ছেলে কিনতে। ভেগে এলে দাম শুনে।

এও তো সমস্যা। বেশি শিক্ষিত হয়ে গেলে মেয়ের মানানসই বর চাই। পাই কোথায়? জামাইকে বলেছেন কাজিসাহেব। দেখো তো বাপু ঢুঁড়ে-টুড়ে, ওখানে তোমার মত ছেলে আর একটা যদি মেলে।

শাহাবুদ্দিন কথা দিয়ে গেছে।

জোহরা কিন্তু হাসছিলেন মেয়েকে দেখে। ···আয়। অবেলায় ঘুমোনোর এই এক জ্বালা। গা ম্যাজ ম্যাজ করে। আমিও আঁচল বিছিয়ে খানিক গড়িয়েছি। ময়নার মা এসে ডাকল খিড়কির দোরে। খুলে দিয়ে বললাম, তুমি সব আপন হাতে বেরে করে ইঁদারায় নিয়ে যাও। আমি একটুখানি চা খাই। যা ধকলটা গেল।

রাণু থামে হেলান দিয়ে বারান্দায় বসে নিচের উঠোনে পা ঝুলিয়ে দিল। মা জামাইয়ের জন্যে কেনা নতুন সেটের কাপপ্লেটে চা রেখেছিলেন আজ। চায়ে চুমুক দিয়ে রাণু আস্তে বলল, ওদের প্লেন

টেক অফ করার সময় হয়ে এল। এখন প্রায় ছটা। আর মিনিট পনের বাকি।

জোহরা আকাশ দেখে বললেন, হুঁ। আমারও সেইদিকে মন পড়ে আছে। ঘড়ি দেখলাম না একটু আগে? হ্যাঁ রে রাণু, প্লেনে চাপলে নাকি বড্ড গা শিরশির করে। বুলি কী করবে তাই ভাবছি। সব তাতেই চমকে ওঠা মেয়ে। মুর্গির জান।

রাণু বলল, একটু পরে সয়ে যায়। মন্টু সেবার ঢাকা থেকে প্লেনে এল। বলছিল, ওঠার সময় আর নামার সময় একটু অস্বস্তি হয়। কখনো প্লেন নাকি এয়ারপকেটে ঢুকে গেলে মনে হয় তলিয়ে যাচ্ছি।

সে কী রে! এয়ারপকেট আবার কী জিনিস? কিছুটা ভয় কিছুটা খুশির ভাব জোহরার মুখে।

রাণু একটু হাসল। তোমার জামাই তো বলে গেছে একবার নিয়ে যাবে। তখন টের পাবে।

জোহরা শিশুর মত খিক খিক করে হাসলেন। আমি বাপু জান গেলেও ওতে চাপব না। যেতে হয়, তুই যাস। বুলিকে দেখে আসবি। মনে বল পাবে।

জোহরা হঠাৎ সস্নেহে হাত বাড়িয়ে অনেককাল বাদে বড় মেয়ের মাথা ছুঁলেন। তারপর তেমনি হঠাৎ বললেন, ইস্কুলে ছুটিছাটা হলে, তোর দশা দেখে কষ্ট হয় রে। চুলের এ কী অবস্থা। যা, চিরুনি নিয়ে আয়।

রাণু বলল, আচ্ছা মা, বুলি চিরকাল নদী দেখে মানুষ, সে ওখানে · মায়ের মুখ দেখে থেমে গেল সে। ভারি মুখে জোহরা উঠে গেলেন। ঘর থেকে একটা বড় চিরুনি এনে মেয়ের পিঠের কাছে বসলেন। কেন যেন ধরা গলায় বললেন, বুলি বিলিতী শ্যাম্পুটা রেখে গেছে দেখলাম। কাল ভাল করে চুল ধুবি না। এত চুল! সেই দেখেছি আমার শাশুড়িবিবির মাথায়। কী চুল, কী চুল! তোকেই দিয়ে গেছেন বিবিজী।

রাণু আবার খাওয়ার ভংগিতে বসল। জোহরা তার চুলে চিরুনি টানতে থাকলেন। রাণুর চোখ আকাশে। আকাশে দিন শেষের ঘোর লেগেছে। বুলি এখন প্লেনে। রূপকথার দৈত্য টুক-টুকে ফর্সা এক রূপসী পরীকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বুলি কি এখন আপার কথা ভাবছে? বুলির আপা থামে হেলান দিয়ে আকাশ খুঁজে হন্যে হচ্ছে, সে কি টের পাচ্ছে? রাণুর চোখ ভিজে এল।

বাড়ি এখনও ফাঁকা লাগে, না রে? জোহরা বললেন। খালি ভাবি, তুই যখন যাবি, তখন কী করব?

রাণু আস্তে বলল, আমি কোথাও যাব না মা।

জোহরা কানে নিলেন না। শ্বাসপ্রশ্বাস মিশিয়ে বললেন, নাজিমের বউ এলে তখন আমার আরও দুর্গতি।···

দুই

সামনের দিক থেকে একটা বাস আসছিল। নাজিম একহাতে স্টিয়ারিং ধরে অন্য হাতে গোঁফের ডগা পাক দিতে দিতে বলল, একটু-খানি ভড়কি দিই গুরু, কী বলো? শালা নারাণদাটা মহা পাজি!

কাটোয়ায় দুপুরে খাওয়াটা চাপাচাপি হয়ে গেছে। সারাপথ ঝিমোচ্ছে জগন্নাথ। পারুল ট্রানসপোরটের মালিকের ভাগ্নে। মারোয়াড়ির আড়তে মাল তুলে খালি ট্রাক ফিরে আসছে। পথে হাত-লবকা কিছু মাল পেতে পারে, নাও পারে। কিন্তু সন্ধ্যাতেই ফিরতে হবে। মামার হুকুম। খালি গাড়ি নড়বড় করে লাফাতে লাফাতে ছুটেছে। তাতে ঝিমুনি বেড়ে গেছে জগন্নাথের। কষা দিয়ে পানের রঙমাখা লালা গড়াচ্ছে। পেছনের খোলে ওই হুড়মাতুনির মধ্যে চারজন লোক তেরপল পেতে মড়ার মতো পড়ে আছে।

নাজিমের খোঁচা খেয়ে জগন্নাথ লাল চোখে বোবার মতো তাকাল। নাজিম বলল, ঘুমোচ্ছিলে বাপ জগাই? আছো ভালো। বলছিলাম, দিই নারাণদাকে একটু চটিয়ে।

তারপরই জগন্নাথ বুঝেছে মতলবটা কী। এ কিছু নতুন খেলা নয় নাজিমের। রাস্তার একেবারে মাঝ বরাবর গাড়ির মাথা। সামনে বাস।

এ্যাই এ্যাই করে ওঠার পর কী ঘটল জগন্নাথ টের পেল না। নাজিম সোজা হয়ে বসে আছে। ঠোঁটে কেমন একটা হাসি। বলল, ঘুরে দেখ তো গুরু, কী অবস্থা হল!

জগন্নাথ আঁতকে উঠে মুখ বাড়াল। ঘুরে দেখল, বাসটা সবে চাকা তুলেছে মাঝ রাস্তায়। ভাগ্য ভাল, এখানে রাস্তার কিনারায় কাঁচা অংশটা বেশ চওড়া। জগন্নাথ চটে গিয়ে বলল, তুমি মাইরি কবে নিজেও ফাঁসবে, আমাদেরও ফাঁসাবে। ছ্যাঃ! অতগুলো লোক বোঝাই বাস—তার মধ্যে কত মেয়েছেলে, কাচ্চা-বাচ্চা আছে!

নাজিম বলল, আরে না না! নারাণদাকে অত বেহুঁশ ভেব না বাপ। মুখে তোমাকে গুরু-গুরু করছি বটে, আমার আসল গুরু ওই নারাণদা।

জগন্নাথ হাসল। ভাল গুরুদক্ষিণা দিতে যাচ্ছিলে নাজুদা! নাও বুদ্ধির ঘরে ধুঁয়ো দাও!

নাজিম মুখ বাড়ালে জগন্নাথ সিগারেট গুঁজে দিল। হাওয়া বাঁচিয়ে লাইটার জ্বেলে ধরিয়ে দিল। নাজিম বলল, একবার বসবে নাকি গুরু? খালি ঘুম পাচ্ছে আমার।

জগন্নাথ খুশি হয়ে বলল, কই, সরো।

মওকা পেলে জগন্নাথ স্টিয়ারিংয়ে বসে। এখনও তত হাত পাকেনি। গাড়ি বোঝাই থাকলে তত সাহস পায় না। কিন্তু খালি গাড়ি এবং এ রাস্তাটাও তত ভিড়ের নয়। বছরখানেক আগে গঙ্গার পশ্চিম তীরে রেললাইনের সমান্তরাল হাওড়া হয়ে কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ করতে এই পরিকল্পনা। এখনও পুরোটা পাকা হয়নি। বহরমপুরের কাছে চৌত্রিশ নম্বর জাতীয় সড়ক গঙ্গা পেরিয়ে এলে তার সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে।

জগন্নাথ স্টিয়ারিং ধরে বসে বেসুরো গলায় হিন্দি ফিল্মের গান গাইতে লাগল।

নাজিম পা ছড়িয়ে বসে চোখ বুজে সিগারেট টানছিল। আবুধাবি থেকে শাহাবুদ্দিন এসে তার মাথার ভেতর একটা স্বপ্ন গুঁজে দিয়ে গেছে। দেড়শো ফুট চওড়া ঝকঝকে স্ল্যাবে নিঃশব্দে গড়িয়ে চলেছে একটা ট্রাক—দু'ধারে রুক্ষ পাথুরে মাটি, লালচে টিলা। হাওয়ায় পেট্রলের কড়া গন্ধ। পকেটে কড়কড়ে ডলারবিল নিয়ে শেখরা হাত তুলে ডাকছে। আর কী সব মোটর গাড়ি! কোথায় আছ নাজু, খনখনে ক্যানস্তারার মতো মরচেধরা লঝঝড় গাড়ির স্টিয়ারিংয়ে বসে? ঘণ্টায় আশি মাইল ছুটে এসে গালফের ধারে পামগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে বিলিতি সিগারেটের ধুঁয়ো ছাড়ো আর গোঁফে তা দিয়ে দুনিয়াটাই বাদশাহের চোখে দেখ। খোদার কসম, আরবদুনিয়ার রকমটাই আলাদা। ওখানে না গেলে বুঝতে পারবে না কী বলতে চাইছি। তবে ট্রাক ড্রাইভারই বা হবে কেন? কনস্ট্রাকশানের কত কাজ আছে—টেকনিসিয়ানও হয়ে যেতে পারো। তোমার মতো ছেলের পক্ষে দু'দিনই যথেষ্ট। অ্যামেরিকান টেকনিসিয়ানদের পেছনে ছুটো দিন ঘুরবে। অবশ্য ক্যাটারপিলারের ড্রাইভার হতেও পারো। রাস্তা তৈরির কাজ হচ্ছে। যা মাইনে দেয়, ভাবতে পারবে না। তার ওপর কত সুযোগ-সুবিধে। টেকনিক্যাল ওয়ারকারদের ওরা খুব খাতির করে। তুমি এখন থেকেই বরং সাধারণ পাসপোরটের দরখাস্ত দিয়ে রাখো। ইমি-গ্রেশানের ঝামেলা আমি ওখানে পৌঁছলে চুকিয়ে ফেলব। ভিসা পেতেও অসুবিধে হবে না। কী? রাজি তো?

নাজিম বলেছিল, হুঁ-উ। কিন্তু এখন চোখ বুজে সিগারেট টানতে টানতে সে সোজা হয়ে বসল। বলল, ধুস শালা। তারপর সিগারেটটা বাইরে ছুঁড়ে দিয়ে অকারণ থুথু ফেলল।

জগন্নাথ বলল, কী হল নাজুদা?

ওই শালা আবুধাবি। নাজিম খিকখিক করে হেসে উঠল।

আবুধাবি? মানে···ও। জগন্নাথ টের পেয়ে বলল। তোমার জামাইবাবু যেখানে থাকেন?

হুঁ। নাজিম হাত বাড়িয়ে খোপ থেকে চিরুনি নিয়ে চুল আঁচড়াতে থাকল। ঝাঁকড়মাকড় একমাথা চুল তার। প্রায় জট পাকিয়ে আছে। ট্রাক ড্রাইভারের চুল। রাস্তার ধুলো খেতে খেতে এই অবস্থা। নাজিম কোনরকমে চুলগুলো শায়েস্তা করে জলের বোতলটা নিল। মুখ বাড়িয়ে খানিকটা জল মুখ চোখে ছড়িয়ে রুমালে মুছে নিল। তারপর বলল, সরে এস জগাই। সামনে হাইওয়ে। এ বয়সে জানটা মেরে দিও না।

জগন্নাথ বলল, তোমার শিক্ষা নাজুদা। দেখ না একটুখানি!

চোপ বে। নাজিম হাত বাড়িয়ে স্টিয়ারিং ধরে অদ্ভুত কায়দায় জগন্নাথের শরীরটা দুই উরুর ওপর দিয়ে এধারে পাচার করে দিল। মেয়েমানুষ হয়ে জন্মাতে গিয়ে পুরুষ হয়েছ জগু! আমি খালি ভাবি, তুমি মেয়ে হলে তোমার মামা আমার সঙ্গে ছাড়ত কিনা। কী মনে হয় বলো তো?

জগন্নাথ লাজুক মুখে বলল, না ছাড়লে আমি নিজেই আসতাম।

ওরে আমার বিবিজান রে! বলে নাজিম মুখ বাড়িয়ে ওর গালে চুমু খাওয়ার ভঙ্গি করল।

আবুধাবির কথা কী বলছিলে নাজুদা?

উঁ?

তখন যে বললে?

নাজিম হাসল। সেখানে নাকি হাওয়ায় টাকা উড়ছে। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে, কেটে পড়ি শালা এসব রদ্দি জায়গা ছেড়ে। মাঝে মাঝে ভাবি, ধুস! বাপ-দাদার দেশ ছেড়ে গিয়ে সুখ কোথায়? আর, তার চেয়ে বড় কথা কি জানো ওস্তাদ? আমার আব্বার শিক্ষা এটুকুন। মন দিয়ে শোনো কথাটা।

জগন্নাথ বলল, শুনছি।

পারটিশানের সময় আমি মায়ের কোলে। নাজিম সামনে দূরে

তাকিয়ে বলল। বছর আড়াই হবে তখন বয়স। আর আমার দিদির বয়স, ধরো আর দুব'ছর বেশি। কেমন তো?

হুঁ। জগন্নাথ হাসতে হাসতে বলল। কিন্তু শিক্ষাটা কী?

চোপ বে। খালি গোলমাল করে দেয়। নাজিম চটে গেল। গোড়াপত্তন করতে দাও।

এই সময় একটা তেরপল ঢাকা বোঝাই ট্রাক এল সামনের গাছ-পালায় ঢাকা বাঁক থেকে। নাজিম সাবধানে চাকা নামিয়ে তাকে রাস্তা দিল। জগন্নাথ টের পায়, ট্রাক ড্রাইভারদের মধ্যে একটা নৈতিক বোঝাপড়া আছে যেন। আবার বাস ড্রাইভার বা অন্যান্য গাড়ির ড্রাইভারদের তারা মওকা পেলে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব জানিয়ে দিতে ছাড়ে না। নাজিম একটু কেশে বলল, তোমার তখন জন্ম হয়নি জগু। তোমার বাপ তখন বিয়ে করেছিল কিনা, সেও সন্দেহ আছে। কুতুবগঞ্জের সে হালচালের কথা তুমি শুনে থাকবে। আমি তো অনেক বড় করে শুনেছি। আব্বার মুখ জানো তো? খুললে দরিয়া, না খুললে পর্বত। তো অত কাণ্ডতেও আব্বা ভিটে ছেড়ে যায়নি।

জগন্নাথ বলল, কাণ্ডটা কী? রায়ট-ফ্রায়ট লেগেছিল নাকি?

আরে না। রায়টের কথা কে বলছে? নাজিম বিরক্ত হয়ে বলল। পরস্পরের ওপর সন্দেহ, অবিশ্বাস এসব জিনিস বড় ডেন-জারাস জগু। বুঝলে? তার ওপর পরস্পর পরস্পরকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য আর হেনস্থা করছে।

কেন, কেন?

নাজিম আস্তে বলল, মুরশিদাবাদ জেলা পাকিস্তান হবার কথা ছিল। আগের দিন নাকি হয়েও ছিল। চাঁদতারা ফ্ল্যাগ উড়িয়ে ছিল সবাই। পরদিন ঈদের নামাজ। হঠাৎ খবর এল, মুরশিদাবাদ্ পড়েছে ভারতে।

জগন্নাথ বলল, হাইওয়ে এসে গেল। তেল-টেল নেবে নাকি দেখ নাজুদা। চা-ফাও খেতে হবে।

নাজিম বলল, শালা দুনিয়ায় কত ঝড় হয়, বানবন্যা হয়, কত তছনছ হয়। তারপর মানুষ চোখের জল পাছায় মুছে আবার কোমর বেঁধে কাজে লাগে। এটাই নিয়ম গুরু। আমার যখন বারো বছর বয়েস, ইস্কুলে ইস্তফা দিয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি, ঢাকা থেকে. আমার চাচারা খুব তাগিদ দিতেন, নাজুকে রেখে যাও। শালা! 'এ গাঁয়ে ভাতার জোটে না তো নগাঁ-সিঙ্গাড়!'

কী, কী?

তুমি বীরভূমের ছেলে, একথার মানে বোঝ না। নাজিম হাসতে লাগল। নগাঁ-সিঙ্গাড়ের নাম শোননি? এই হাইওয়ের ধারে পড়ে। নবগ্রাম থানার পাশ দিয়ে যাওনি বাঞ্চোত?

জগন্নাথ হাসল।...ওগাঁয়ে খুব বর ছিল বুঝি?

কে জানে। একটা সিগারেট দাও।

জগন্নাথ ওর ঠোঁটে সিগারেট গুঁজে দিলে নাজিম বলল, আবু-ধাবির জামাইবাবু আমাকে একটা লাইটার দিয়ে গেছে। ভুলে গেছি সঙ্গে নিতে। দেখে তোমার চোখ জ্বলে যাবে ওস্তাদ। হুঁ, জ্বালো।

জগন্নাথ জ্বেলে দিয়ে বলল, সিগনাল ডাউন হলে আধঘণ্টার ধাক্কা। সাহেবগঞ্জ এক্সপ্রেসের সময় হয়ে এল।

স্পিড বাড়িয়ে নাজিম কিছুক্ষণ চুপচাপ সিগারেট টানতে থাকল।

জগন্নাথ বলল, ধুর! চা-ফা খাওয়া হল না। ওখানে দারুণ সিঙ্গাড়া করে মাইরি!

নাজিম বলল, সারাপথ তো পেন্টলের বোতাম খুলে পেটে হাত বুলিয়েছ বাবা!

হজম হয়ে গেছে।

বেশ তো, চলো না। সিঙ্গাড়া খাওয়াচ্ছি পীরতলার মোড়ে।

কোথায়, কোথায়?

তোমার শাশুড়ির বাড়িতে।

জগন্নাথ হাসতে লাগল।...বুঝেছি বুঝেছি।

কী বুঝেছ মানিক ?

জগন্নাথ হঠাৎ হাসি থামিয়ে বলল, কিন্তু সাতটার মধ্যে গাড়ি পৌঁছে দেওয়া চাই। মামার হুকুম। নটোদার কী সব মাল আছে। রাতেই সাগরদীঘি যাবার কথা।

নাজিম ভুরু কুঁচকে বলল, আমি যাব ভাবছ নাকি ? ওরে চাঁদ আমার। গঙ্গায় মুখ ধুয়ে আসতে বলো তোমার মামুকে। শালা ! আমি যেন ঘরের মাগ !

জগন্নাথ হাত নেড়ে বলল, আরে না, না ! রামলাল যাবে। মামা বলেছে।

রামলাল ? নাজিম হো হো করে হেসে উঠল। সেদিনের মতো গুঁড়ো-পাশলার বিলে ঠ্যাঙ তুলে পড়ে থাকবে গাড়ি। রামার গা শুঁকে দেখেছ কখনো ? ভকভক করে হাঁড়িয়ার গন্ধ ছোটে। এতক্ষণ দেখগে, সাঁওতালডাঙায় হাঁ করে আছে আর সুরিন হাড়াম তার হাঁয়ে ঢালছে। শালা পারেও মাইরি।

জগন্নাথ বলল, তুমি বুঝি খুব সাধু নাজুদা ?

চুপ, চুপ ! নাজিম মোড়ের মাথায় ট্রাক ঘোরাল। ঘন গাছ-পালায় ঢাকা গ্রামের ভেতর দিয়ে এবড়ো-খেবড়ো খোয়া ছড়ানো রাস্তায় খুব শব্দ করে এগোল গাড়ি। জায়গায় জায়গায় পিচ আছে। শেষ বেলার ছায়া এঁটে গেছে গাঁয়ের ভেতর। দড়ি ছিঁড়ে একটা ছাগল দিশেহারা হয়ে পালাচ্ছে। কাচ্চাবাচ্চারা আওয়াজ পেয়েই দুধারে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে। ছ'মাসও হয়নি এই লিংকরোডের বয়স। তাই এত সাড়া। টিউবেলে জল ভরতে ভরতে গাঁয়ের বউ-ঝি হঠাৎ সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে মোটর গাড়ি দেখছে।

পীরতলার মোড়ে গিয়ে আবার ভাল রাস্তা। বিশাল বটগাছের মাথায় সাদা পতাকায় চাঁদ তারা আঁকা রয়েছে। পীরের দরগা তার তলায়। একসময় প্রচণ্ড রবরবা ছিল। মানুতে পোড়ামাটির ঘোড়া ছড়িয়ে আছে অসংখ্য। এপাশে-ওপাশে কয়েকটা ছোট্ট চা-পান-বিড়ি আর খাবারের দোকান। রাস্তার অন্য ধারে ফাঁকা হাটতলার

সারবাঁধা আটচালাগুলো ফাঁকা পড়ে আছে আজ। হাট বসে সপ্তায় দুদিন।

লোক বোঝাই একটা বাস ছেড়ে গেল। বাসটার মাথাতেও গাদাগাদা লোক। দুটো ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে একধারে। ড্রাইভাররা রাস্তার ধারে ঘাসে হাত-পা ছড়িয়ে বসে আছে। একটা লোক মাটির হাঁড়ি থেকে গেলাসে সফেন তাড়ি ঢেলে দিচ্ছে। নাজিম আরও এগিয়ে প্রাইমারি স্কুলটার সামনে ট্রাক দাঁড় করাল।

জগন্নাথ ঘড়ি দেখে বলল, পৌনে ছটা। বাঁচা গেল বাবা! আব আধঘণ্টাই যথেষ্ট। কী বলো নাজুদা?

নাজিম নেমে পা বাড়িয়ে বলল, ওদেব ওঠাও জগু। চা-ফা খাইয়ে দাও আমি আসছি।

জগন্নাথ লাফ দিয়ে নামল। ··দেরি কবো না সেদিনকার মতো।

না বে! পীরিতের মাগের কাছে যাচ্ছি নাকি? দেরি কবব কেন?

নাজিম বাঁশবনেব ভেতর ফালি বাস্তাটা দিয়ে হনহন করে এগোচ্ছিল। বাঁশবনের ভেতর আবছা আঁধার জমেছে। কদিন আগের বৃষ্টিতে মাটি স্যাঁতসেঁতে। মাটি ঢেকে থরেবিথরে ভিজে বাঁশপাতা কী এক গন্ধ ছড়াচ্ছে। পোকামাকড়ের ডাকাডাকি শুরু হয়ে গেছে সাততাড়াতাড়ি।

বাঁশবন পেরিয়ে গেলেই সামনে গঙ্গা। আকাশটা হঠাৎ অনেক বড় লাগে। এমন গ্রীষ্মে একসময় বালির চড়া ধু-ধু করত। তাব ফাঁকে ফাঁকে কালো জল থমথম করত। এখন ফরাক্কা থেকে বারোমাস জল এসে বুক ভরে রেখেছে। পাড়ে আকন্দ সাঁইবাবলার ঝাড় ঝুঁকে পড়েছে জলের দিকে। ওপারে সাদা মাটিব ক্ষেতেব শেষে টানা সবুজ দাগ।

গাবতলায় দাঁড়িয়ে এদিকে তাকিয়ে আছে কাশেম জুয়াড়ীর মেয়ে মুন্নী। আঁটসাঁট গড়ন, কালো নয়—শ্যামলা রঙ, কপালে লাল টিপ। ভরাট গাল, সরু নাকে নাকছাপি, পিঠে এলানো চুল। পরনে

ডংলাছাপ শাড়ি, হাতকাটা লাল ব্লাউজ। খালি পায়ে আলতার বেড়ি। ভুরু কুঁচকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে নাজিমকে দেখছে।

নাজিম প্যান্টের হিপকেটে হাত ভরে হাল্কা চালে এগিয়ে গেল। ওস্তাদ আছে নাকি?

মুন্নী নির্বিকার মুখে মাথাটা শুধু দোলাল।

আচ্ছা, চলি। ওস্তাদকে বলো নাজিম এসেছিল।

জবাগাছের আড়াল থেকে উঠে দাঁড়িয়ে কাশেম বলল, নাজুমিয়া? আছি বাপ। যাবটা কোথা? এস, এস।

নাজিম হাসল।···তোমার বেটি বলল, নেই।

মুন্নী মুখ খুলল।···তা বলিনি।

মাথা নাড়লে! বলে নাজিম এগিয়ে গেল বাড়ির দিকে। মাথা নাড়লে তাই তো মানে দাঁড়ায়।

কাশেম খুরপি হাতে ফাঁকায় এসে বলল, ওর কথা বলা ওইরকমই। তবে মাথা নাড়লে হ্যাঁও হয়, নাও হয়। এস বাপধন, বসো। মুন্নী, তালাই দিয়ে যা। ফাঁকাতেই বসি। কই মিয়াসাব, সিগারেট দাও!

মুন্নী বাড়ি ঢুকল তালাই আনতে। একতালা পাকাবাড়ি করেছে কাশেম গাঁয়ের এক টেরে। বরাবর একানড়ে হয়ে থাকে। ঢ্যাঙা, একটু কুঁজো, রোগাটে গড়ন। সূচলো মস্তো গোঁফ। বাবরি কাঁচা-পাকা চুল। দেখে মনে হবে, গানবাজনার ওস্তাদ। পান খাওয়ার চোটে সব দাঁত কালো। শুধু একটা দাঁত সোনার। ঠিক মধ্যিখানে। এখন পরনে গেরুয়া রঙের লুঙ্গি। গায়ে সাদা ফতুয়া। শিরাওঠা হাতে স্টিলের বালা আর নানান ধাতু বসানো আংটি। পায়ে রবারের স্যাণ্ডেল কাদা লেগে আছে। গলায় চিকচিক করছে মিহি রুপোর চেন। বলল, গাড়ি পীরতলায়? কুতুবগঞ্জ থেকে আসছ, নাকি ফিরছ বাপ?

ফিরছি। কাটোয়া গিয়েছিলাম।

মুন্নী তালাইয়ের বদলে নকসাকাটা নতুন শতরঞ্চি এনে দিল। আস্তে বলল, চায়ের পানি চাপাব নাকি?

তা আর বলতে হবে রে মা ? কাশেম বলল। বসো মিয়াসাব। গাবতলাটা কেমন বাঁধিয়েছি দেখছ ? ইচ্ছে আছে, পাকা করে দেব। কিন্তু সিমেণ্টের যা দর।

নাজিম বুকপকেট থেকে শাহাবুদ্দিনের দিয়ে যাওয়া বিলিত সিগারেটের প্যাকেট বের করল। খাও চাচা, ফরেন ধুঁয়ো টেনে দেখ।

কাশেম সিগারেটের প্যাকেটটা দেখে বলল, কী দেখাচ্ছ বাপজান। জলঙ্গী, লালগোলা বা সুপারিগোলার হাটে খেলতে গেলে গাদা গাদা নিয়ে আসি। বর্ডারে ফরেন মাল উড়ে আসছে। পেণ্টুলের কাপড় এনে রেখেছি একটা। জামাইশালাকে দেব বলেই এনেছিলাম। পরশু ঝগড়া করে ভেগেছে। মুখে মুতে দেব শালার !

মুন্নীর বরকে দেখেছে নাজিম। মুখে বসন্তের দাগ, একটা চোখ ক্ষয়ে গেছে। নাজিমেরই বয়সী সে। কান্দির ওদিকে কোথায় বাড়ি। পীরতলা প্রাইমারি স্কুলে কী ভাবে মাস্টারি জুটিয়েছিল। বেচারার নাকি বিদ্যের দৌড় অনেকখানি। চোখের জন্য পাত্তা পায় না কোথাও। শেষে প্রাইমারি শিক্ষক হয়েছিল। কাশেম বলেছিল, জামাই 'গারজুয়েট'। কে জানে! তবে সে জুয়াড়ির নিরক্ষর মেয়েকে কীভাবে বিয়ে করল, নাজিম বুঝতে পারে না।

মেয়েটাকে সেই কবে থেকে দেখছে নাজিম, গোড়ার দিকটা মনে নেই। আবছা মনে ভাসে ঢিলে ফ্রকপরা এক কিশোরীর শরীর, এবং বুকে চোখ আটকে যায়—তা তুমি যতই ভালমানুষ হও না কেন। জুয়াড়ী বাপের সঙ্গে ঘোরে দেশে-দেশে, হাটতলায়, মেলায়, কোথায় না! কুতুবগঞ্জে গঙ্গার ধারে শ্রাবণে ঝুলনের মেলায় সেবার কাশেমের ছকে খেলতে বসেছিল নাজিম। হঠাৎ দড়বড়িয়ে বৃষ্টি এল। কারবাইড বাতি জোরালো ভিজে হাওয়ায় নিভে গেল। মেলার পেছন দিকটায় স্টেশনের রেল-ইয়ারড ঘেঁষে ঝোপঝাড়ের ভেতর খোলা আকাশের নিচে অসংখ্য জুয়াড়ী আসর বসিয়ে পয়সা লুটছিল। তক্ষুনি সব ছত্রভঙ্গ হয়ে কে কোথায় দৌড়ুল। সেই ফাঁকে ক'জন মস্তান মুন্নীকে ধরেছে। মুন্নী চেঁচিয়ে উঠেছিল বোবার মতো। কাশেম তখন ছক

গুটোতে ব্যস্ত। এসব সময় লুটপাট হওয়া অসম্ভব নয়। নাজিম দেখেছিল, মালগাড়ির পেছনে নিয়ে গেছে মুন্নীকে। ততক্ষণে মেয়েটার মুখ বন্ধ। ড্যাগার খুলে নাজিম দৌড়ে গিয়েছিল। আবে হারামী-বাচ্চারা! বলেই ড্যাগারের খোঁচা। কারুর পাছায়, কারুর পেটে, কারুর হাতে।...

কাশেম তারপরও মেয়েকে নিয়ে কত জায়গায় ঘুরেছে। তবে মেয়েটাও এমনি করে চোট খেতে-খেতে হুঁশিয়ার হয়ে উঠেছিল। পদ্মার ধারে সীমান্ত এলাকায় দুই দেশের জুয়াড়ীদের যোগসাজসে প্রায় সারাবছর একটা না একটা ছুতো ধরে মেলা বসত। একবার কারা মুন্নীকে তুলে নিয়ে নৌকোয় চাপিয়েছিল। ওপারে গেলে আর তার ফেরার উপায় থাকত না। কারুর বিবি হয়ে অসংখ্য ছেলেপুলেব জন্ম দিতে দিতে বুড়ি হয়ে যেত। নাজিমের তাই মনে হয়েছিল।

মুন্নীর ব্লাউজের ভেতর ড্যাগাব লুকোনো ছিল। একটু চাপা স্বভাবের মেয়ে। অনেক উত্যক্ত করার পর বলে, সতীলক্ষ্মী সেজে চুপ করে বসেছিলাম। একটা লোক খালি পটাচ্ছে আর পিঠে হাত বুলোচ্ছে। তার গলায় চাকুর খোঁচা মেরেই ঝাপ দিয়েছি পানিতে। আমি গঙ্গাধারের মেয়ে। পানির কোলে জন্মেছি।

কাশেম বাকিটা বলে।...ততক্ষণে বরডার ক্যামপের তামাম ফোরস বেরিয়ে পড়েছে মোটর বোট নিয়ে। এদিকে আরও বিস্তর লোক নৌকো করে খুজে বেড়াচ্ছে। হাজার হলেও ইণ্ডিয়ার মেয়ে। পাকিস্তানীরা লুঠ করে পালাবে এত কলজে? টরচের আলো পড়ছে পদ্মায় এদিকে ওদিকে। তারপর গুড়ুম গুড়ুম করে আওয়াজ হচ্ছে বন্দুকের। কিন্তু কোথায় আমার বেটি? বুক চাপড়ে কাঁদি আর নাকে খত দিই—আর কখনো যোয়ান বেটি সঙ্গে নিয়ে ঘুরবো না।

মুন্নী মুখটিপে হেসে বলে, ওরা যখন পদ্মার পানি চষে বেড়াচ্ছে, তখন আমি ভিজে কাপড়ে চরে দাঁড়িয়ে আছি। খানিক পরে টরচ বাত্তির আলো পড়ল আমার গায়ে।

বেহায়া কাশেম তবু বেটিকে সঙ্গ ছাড়া করত না। যেখানে ছক পেতে বসেছে, সেখানেই কারবাইড বাত্তির আলোয় দেখা গেছে মুন্নী আছে। একপাশে চুপচাপ বসে প্যাটপ্যাট করে তাকাচ্ছে। নির্বিকার চাউনি। ওই চাউনি অনেক ঠকে শিখেছিল মুন্নী এবং ওই চাপা স্বভাব ভাবলেশহীন মুখ অনেক ঘা খেয়ে তৈরি, নাজিম তা বোঝে। কতবার পীরতলা থেকে ট্রাকে ওদের বাপবেটিকে তুলে কত জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে তার যাওয়ার পথে। অনেক সময় ইচ্ছে করেছে কাশেমকে বেধড়ক পেঁদিয়ে উচিত শিক্ষা দেয়। কিন্তু কাশেমের মুখে কী এক জাদু আছে। দেখলেই মনটা নরম হয়ে যায় নাজিমের। বেটির বিয়ের যোগাড় করছ না কেন বললে হয়তো ভাববে, নাজিমের মনেই একটা মতলব জেগেছে। মাথাখারাপ বে? তোমার সাতঘাট চরানীকে বউ করে ঘরে তুলবে মবিন কাজির বেটা, খানবাহাদুরের নাতি? নাজিম ট্রাক চালায় বটে, এ অভিমান তার রক্তে আছে। সাগরদীঘির আড়তের বাবু তাকে বলেছিল, এই যে নাজিম সেখ! এবং নাজিম রুখে বলেছিল, কোন্ শালা সেখ বে? কাজির বাচ্চা, খানবাহাদুরের নাতি। স্টিয়ারিং ধরেছি বলে জাত গেছে নাকি বে?

খানবাহাদুর শুধু মহকুমায় না, প্রায় সারা জেলায় শ্রদ্ধেয় লোক ছিলেন। নাজিম সেই খাতিরটা পায়। আর তার চেহারাও একটা কথা। অবসরের সময় সেজেগুজে বেরুলে তাকে বড় সম্ভ্রান্ত দেখায়। কিন্তু ঝোঁকের মুখে শালাবাঞ্চোত এবং বে বেরিয়ে পড়ে চেহারাটাই চিড় খেয়ে যায়। গেলেও তার পরোয়া নেই। বড় বোন এম, এ, বি, টি, গারলস স্কুলের অ্যাসিসট্যাণ্ট হেডমিসট্রেস। ছোট বোনও বি, এ, পাশ। সম্প্রতি আবুধাবির এক ইঞ্জিনীয়ারের বউ হয়েছে। নাজিম ট্রাক চালক আর লেখাপড়ায় কমজোর হোক, তাতে কী? নাজিম ইয়ার-বন্ধুদের আড্ডায় হাসির ছলে এসব শুনিয়ে দিতে ছাড়ে না। তারপর বলে, আমার ভিতটা খুব পাকা বে।

তাহলে এই যে মাঝেমাঝে ছুট করে চলে আসে, তার মানেটা কী? কাশেমের মনে এসব কথা আসে বইকি। এলে যখন জবাব

খোঁজে, অনেক বছর আগে কুতুবগঞ্জে পীরের উরসের মেলার কথা মনে পড়ে যায়। ফুটফুটে ছেলেটি, বছর দশবারো বয়েস, হাফ পেনটুল আর হাফ শারট পরনে—ছকের সামনে বসে সিকিটা আধুলিটা ফেলত। হেরে গেলেও খুশি, জিতলেও খুশি। এমন খেলুড়েকে বুকে টেনে বলতে ইচ্ছে করে, আয় বাপ! শুধু দুজনে মিলে খেলি আয়! এ খেলা তো নিছক রুজির ধান্দা নয় কাশেমের, তার খুলির মধ্যে কে এক ওস্তাদ জুয়াড়ী বসে সারাক্ষণ রঙ বেরঙের ছক পেতে হাড়ের চকচকে ঘুটি চামড়ার কৌটোয় নাড়া দিয়ে দিয়ে খড় খড় করে ছড়িয়ে ফেলছে।

নাজিম বলল, সময় থাকলে দুদান খেলা যেত চাচা। জগা ঘড়ির কাঁটায় চোখ রেখে সিঙ্গাড়া কামড়াচ্ছে পীরতলায়।

কাশেম কাঁচাপাকা গোঁফে হাত বুলিয়ে চোখ নাচাল।…কাল চলে এস না বাপধন! দুপুর বেলা এখানে জেয়াকত (নেমন্তন্ন) রইল। মুরগি জবাই করব। মোতি কুড়বের এবার তিনটে গাই বিইয়েছে। সমুদ্দুর ঝরছে মাইবি. তোমাব কসম। আসবে?

মোতিকে দেখলাম পীরতলায়। নাজিম হাই তুলে বলল। সর্দারজীদের সেবা করছে।

কাশেম ভুরু কুঁচকে গঙ্গার আকাশ দেখতে থাকল। শেষ বেলায় মিঠে ফুরফুরে হাওয়া আসছে। ঘন গাছপালার ভেতরটা কালো হয়ে উঠেছে। পাখপাখালি হাট বসিয়ে চেঁচামেচি করছে। নাজিম ফের বলল, তোমাব এ জায়গাটা বড ভাল চাচা। শান্তি আছে।

কাশেম বলল, আমার শান্তি কোথা? গতবছর ঘরদোর পাকা করলাম। টিউবেল বসালাম। বেটির বিয়ে দিয়ে জামাই আনলাম। ভাবলাম, এবার আমার হাত পা খালি। উড়ব যখন খুশি যেথা-সেথা। হল না। জামাই-শালা পাছায় লাথি মেরে ভেগে গেল।

যাবে কোথায়? নাজিম সিগারেট চপ্পলের তলায় দলল। মাস্টারি তো আছে।

না বাপ; লক্ষণ ভাল দেখিনি শালার!

নাজিম হেসে উঠল। জামাইকে শালা-শালা করছ চাচা?

মুন্নী ট্রে সাজিয়ে চা আনছিল। সুন্দর নকশাকাটা ট্রের ওপর চায়ের সুদৃশ্য পট, কাপ-প্লেট। একটা প্লেটে বিস্কুট আর চানাচুর। কাশেম হাত বাড়িয়ে ট্রে নিয়ে বলল, শালা বলছি কি সাধে? সুখে খেতে ভূতে কিলোচ্ছিল হারামজাদাকে। ইস! ভারি আমার 'গারজুয়েট' রে! গাঁগেরামের ডোবায় অমন কত 'গারজুয়েট' চুবোনি খেয়ে পচছে। এমন একখানা দালান বানিয়ে দিলাম, আর এই যে চারধারে দেখছ কতখানি জায়গা—ওই আম কাঁঠালের গাছগুলো, তারপব তোমার ওই দেখ বাঁশঝাড়গুলো, সব—সব তো মুন্নী আর তার দাম'াদমিয়াব। না কী বলো?

নাজিম সায় দিল। চোখের তলা দিয়ে সে মুন্নীব পাদুটো দেখছিল। আলতাপরা পায়ে হাল্কা স্লিপার পরে এসেছে।

দেশে দেশে বাপে ঝিয়ে ঘুরতাম, বারোভূতে লুঠে খেত। শেষে একটুখানি থিতু হয়ে বসলাম। তো লে শালা! বাঁকা মুখে চা ঢালতে থাকল কাশেম। আমার কী? আমার বেটিরই বা কী? আমাদের রাস্তা তো সামনে খোলা।

নাজিম হাসতে হাসতে বলল, মুন্নীকে নিয়ে ফের ছকে বসবে নাকি?

হুঁউ। বসব। কাশেম বেটির দিকে চোখ নাচাল। কী রে? বল মিয়াসাবকে।

মুন্নী ঠোঁট কামড়ে ছিল। কোন সাড়া দিল না।

নাজিম চায়ের কাপ নিয়ে বলল, কী মুন্নী? যাবে নাকি?

মুন্নী আস্তে বলল, যাওয়াচ্ছি। সুপারিগোলার হাটে এবার কী কাণ্ড করে এসেছে, শুধোও না?

কাশেম অমনি গুম। নাজিম বলল, ও চাচা! কী করেছ?

কাশেম শব্দ করে চা খেতে থাকল। মুন্নী বলল, গুণ্ডোরা টাকা-পয়সা সব কেড়ে নিয়েছে। আর কী নিয়ে খেলতে বসবে, দেখছি। আবার ধুয়ো ধরেছে, বাঁশগুলো বেচে পুঁজি জোগাড় করবে। করাচ্ছি।

নাজিম বলল, চাচা! কী বলছে তোমার বেটি?

কাশেম হাসল। আরে না, না! ও একটা কথার কথা। যাকগে এসব ধামাচাপা দাও। চাচা-ভাইপো মিলে ছুটো সুখদুঃখের কথা বলি। কাল আসবে তো নাজুমিয়া?

মুন্নী স্লিপারের ডগায় ঘাস খোঁড়ার চেষ্টা করছিল। হঠাৎ মুখ তুলে নাজিমের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। নাজুভাই! তোমার বোন শ্বশুরবাড়ি গেছে শুনলাম। ফরেনে থাকে নাকি দামাঁদমিয়া। সত্যি নাকি গো?

কোথায় শুনলে? নাজিম খুশি হয়েছে এ কথায়।

কুতুবগঞ্জের সব খবর পীরতলায় আসে। বলো না বাবু সত্যি নাকি?

সত্যি।

যখন চিঠি লিখবে, লিখে দিও, আমার জন্য একখানা 'ফরেন' শাড়ি পাঠাতে।

কাশেম খ্যাক খ্যাক করে অদ্ভুত ভংগিতে হাসল।···শোনো কথা। আমার ঘরভর্তি ফরেন শাড়ি। বর্ডারের দিকে ফরেন জামা-কাপড়ে ছয়লাপ।

মুন্নী কড়া মুখে বলল, জাপানী জর্জেটের কথা বলছি। তুমি চেন নাকি জাপানী জর্জেট? যে ক'খানা কিনেছি সব নকল।

নাজিম বলল, লিখব। তবে পাঠানো কঠিন। কাসটমে ধরবে।

কে ধরবে?

আবগারির লোকে। পোস্টাপিসে ফরেন মাল চেক না করে ছাড়বে না।

মুন্নী চুপ করে রইল। কাশেম বলল, তা হ্যাঁ গো নাজুমিয়া, এবার বড় বোনটির একটা ব্যবস্থা করো।

ভেতরে হঠাৎ চটে গেলেও নাজিম শান্তভাবে বলল, আমি কি বাড়ির মুরুব্বি? আচ্ছা, উঠি চাচা!

চায়ের কাপপ্লেট রেখে সে উঠে দাঁড়াল। পকেট থেকে বিলিতি

সিগারেট বের করে চুপচাপ কাশেমের দিকে এগিয়ে দিল। কাশেম নিতে আপত্তি করল না। সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে মুন্নীর দিকে তাকিয়ে নাজিম ফের বলল, চলি মুন্নী।

কাল কিন্তু জেয়াকত। কাশেমও উঠে পা বাড়াল। চাপাগলায় ফের বলল, মোত্তিকে বলে রাখব। যেন কথার খেলাপ করো না বাপ! মনে শাস্তিটাস্তি নেই।

নাজিম বলল, দেখি।

দেখি নয়। বলে কাশেম ঘুরে মুন্নীর উদ্দেশ্যে বলল, অ মুন্নী, তোর নাজুভাইকে জেয়াকত দিচ্ছি। মিয়া বলছে কিনা, দেখি!

মুন্নী একটু হাসল।···আমাদের ঘরে খেলে মিয়াসাবের জাত যাবে জানো না?

নাজিম ঘুরে দাঁড়াল।···খাইনি কখনও? না?

সে তো লুকিয়ে খেয়েছ!

লুকিয়ে মানে?

মুন্নী দমল না!···জুয়াড়ী লোকের বাড়ি খেয়েছ শুনলে কুতুবগঞ্জের মিয়ামোখাদিমরা একঘরে করবে না? তাতে আমরা নাকি জাতে পাঠান।

নাজিম হেসে' ফেলল।···বেশ। তাহলে কুতুবগঞ্জের আরেক মিয়াকে সঙ্গে করেই আসব জেয়াকত খেতে। ও চাচা, আপত্তি আছে নাকি?

কাশেম মাথা দুলিয়ে বলল, আরও জমবে। আরও জমবে। কিন্তু সে ব্যাটা কোন্ সাহেবজাদা—নামটা তো বলবে বাপ?

তোমারই এক সাকরেদ। মোয়াজ্জেম।

কাশেম চোখ কপালে তুলল।···খোনকার হারামজাদা? হেই বাপ, তোর গড় ধরি, ও মাল ঘরে ঢোকাস নে! দুনিয়াচরা মানুষ এই কাশেম খাঁর দুনিয়াশুদ্ধু আপন। শুধু ওইটে বাদে। একটুকরো আস্ত জাহান্নাম!

নাজিম হাসতে হাসতে বলল, বেশ। তাহলে একা আসব।

সে হনহন করে এগিয়ে বাঁশবনে ঢুকল। একবার ঘুরে দেখল, কাশেম গঙ্গার দিকে মুখ তুলে দাঁড়িয়ে আছে আর মুন্নীর দৃষ্টি এদিকেই। ঘুরে হাঁটতে হাঁটতে মনে হল, মুন্নীর চোখ তার পিঠে ছুরির মতো বিঁধছে। এতকাল পরে হঠাৎ এও মনে হল। ইচ্ছে করলে হয়তো মেয়েটাকে পেতে পারত—না, বউ হিসেবে নয়, প্রেমিকা হিসেবেই। অথচ কেন কোনদিনও তেমন ইচ্ছে আসেনি তার ?

বাঁশবনটা হনহন করে হেঁটে পেরুল সে। তারপর পিচের রাস্তায় উঠে শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, ধুস্ শালা !

তিন

স্টেশনের দুই পারেই বাজারটা ছড়িয়ে গেছে। ওপারে গিয়ে ঠেকেছে একেবারে গঙ্গার কিনারায়। পাটোয়ারিজীর গদী, গোড়া বাঁধানো বটতলা, জৈনদের মন্দির পর্যন্ত ভিড় সারাদিন থকথক করে। তারপর শুরু হয়েছে সে আমলের জৈনমহল্লা। বড় বড় বাড়ি, সরু গলি। কিন্তু নিঃঝুম নিরিবিলি ঘুমন্তপুরী যেন। হঠাৎ মনে হবে, কলকাতার চিৎপুরের গলিতে ঢুকে পড়েছি। কিন্তু ভাল করে তাকালে চোখে পড়বে তাদের ক্ষয়াটে চেহারা। আষ্টেপিষ্টে প্রকৃতির শেকল টেনে উপড়ে ফেলবে বুঝি গঙ্গার জলে। গঙ্গাও এখন বারো মাস কূলে কূলে ভরা। ফরাক্কা ফিডার ক্যানেলের জল এসে গঙ্গার যৌবন ফিরিয়ে দিয়েছে।

পাটোয়ারিজীর ছেলে বিমল দরজায় দাঁড়িয়ে ট্রানজিস্টারে বিবিধ ভারতী বাজাচ্ছিল। রাণুকে রিকশোয় দেখে বলল, কোথায় চললে গো রাণুদি ? স্কুল বন্ধ না ?

রাণু চোখ পাকিয়ে বলল, স্কুল বন্ধ বলে তোর পড়াশুনোও বন্ধ ? থাম হতভাগা, পাটোয়ারি জ্যাঠাকে বলছি গিয়ে।

বিমল আওয়াজ কমিয়ে বলল, কাল রাত্তিরে তোমার ফ্রেণ্ড এসে গেছে ডেকে দিই থামো।

রাণু রিকশোওলাকে বলল, রোখো তো সালামভাই। এক মিনিট।

কুতুবগঞ্জে রাণুর ছোটবড় সবার সঙ্গে এমন সম্পর্ক। রেলের গ্যাংম্যানরাও সেলাম দিয়ে বলে, কোথায় চললেন মাস্টারদিদি? সালাম রিকশো থেকে নেমে কপালের ঘাম মুছতে থাকল নোংরা গামছায়। রাণু রিকশোর হুড ফেলে দিল। দোতলা বাড়ির গাঢ় ছায়া গলি রাস্তায়। কী এক ফুলের গন্ধে মউমউ করে গ্রীষ্মকালটা। এ গন্ধে অনেক স্মৃতি এসে জড়িয়ে ধরে রাণুকে। এখান দিয়েই স্কুলে পড়তে যেত। সেই স্কুল এখন হায়ার সেকেনডারি হয়ে উঠেছে পাটোয়ারিজীর মায়ের নামে। পুরনো একটা বিশাল বাড়ি পোড়ো হয়ে গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে ছিল। তার ভোল ফিরিয়ে স্কুল করা হয়েছে। আর সেই স্কুলেই রাণু সারা জীবনের জন্যে কেমন করে আটকে গেল!

খবর পেয়ে গুণমালা দৌড়ে এল কাঁধ অব্দি ছাঁটা চুল, হাতকাটা ব্লাউজ, ঝকমকে ফর্সা চেহারায় কলকাতার লালিত্য ঠিকরে পড়ছে দেখে রাণু চোখ বড় করে বলল, তুই কি সত্যি মালা? এ কী হয়েছিস?

বুঝতে না পেরে গুণমালা হকচকিয়ে নিজের খালি পায়ের দিকে তাকাল। তারপর মুখ তুলে হাসল।···যাঃ! আমি ভাবলাম···

কী ভাবলি? রাণু হাসতে লাগল। তোকে বলছি অন্য কথা। একেবারে ভোল পাল্টে ফেলেছিস শ্বশুরবাড়ি গিয়ে!

গুণমালা বলল, নেমে আয় রাণু। স্কুল তো বন্ধ এখন। যাবি কোথায়?

বড়দির বাড়ি ঘুরে আসি। রাণু রুমালে মুখ স্পঞ্জ করে বলল। কিংবা ইচ্ছা করে তো আয়, নদীর ধারে কোথাও বসে আড্ডা দেব।

দাঁড়া তাহলে। চটিটা পরে আসি।···গুণমালা ফের দৌড়ে ভেতরে চলে গেল।

গুণমালার সঙ্গে রাণুর বয়সের তফাত খুব সামান্যই। ছোটবেলা থেকে একসঙ্গে পড়াশুনা করেছে। দুজনে একসঙ্গে ট্রেনে চেপে কলেজ

করতে গেছে বহরমপুরে। রোজ যাতায়াতের কষ্টটা খুব কম ছিল না। খাগড়াঘাট রোড নেমে বাসে চাপো। বাসে যা ভিড়। উঠতে না পারলে রিকশো করো। তার মানে পুরো দু' টাকা খরচ। গুণমালার বাবা মোহন সিং পাটোয়ারি লাখপতি মানুষ। তাই ওর সঙ্গে সবসময় যথেষ্ট পয়সাকড়ি থাকত। কোনোদিন, বিশেষ করে শনিবারে কলেজের পর সিনেমা দেখাটা বাঁধা ছিল। ফিরতে সন্ধ্যা গড়িয়ে যেত। পাটোয়ারিজী তত কড়া গার্জেন নন।

রাণুর আত্মসম্মানজ্ঞান বরাবর টনটনে। কলেজে পড়ার সময় থেকেই টিউশনি চালিয়ে এসেছে। গুণমালাকে দেনা শোধের কারচুপিতে পাল্টা কোনোদিন রিকশোভাড়া বা সিনেমার টিকিটের দাম মেটাত। গুণমালার একটা বড় গুণ, বড়লোকের মেয়ে বলেও এতটুকু দেমাক ছিল না। এখনও নেই।

বিমল ট্রানজিস্টারের আওয়াজ বাড়িয়ে বাজারের দিকে চলে গেল। এই ছেলেটা পাটোয়ারিজীর সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। রাণুর এমন মনে হয়। আরও দুই ছেলে আর এক মেয়ে আছে পাটোয়ারিজীর। বড় শান্তকুমার তাঁর ব্যবসাতে ঢুকেছে। রাজনীতিও করে না। মেজ রঞ্জনকুমার কলকাতার ব্যবসার চারজে। তিনপুরুষে পাটোয়ারি পরিবার পুরো বাঙালী হয়ে গেছে।

গুণমালা একলাফে রিকশোয় উঠল। রিকশো চলতে থাকল। রাণু বলল, আর ক'দিন আগে এলে বুলির সঙ্গে দেখা হত তোর। ও আবুধাবি চলে গেল বরের সঙ্গে।

গুণমালা বলল, আর তুই কোথায় যাবার প্ল্যান করেছিস রে?

রাণু মুখ টিপে হেসে বলল, আরও দূরে। এত দূরে যে তোরা আর খুঁজেই পাবিনে।

গুণমালা কানের কাছে মুখ রেখে বলল, কাকেও জোটাতে পেরেছিস এতদিনে, তাই না?

রাণু ওর পাঁজরে আঙুলের খোঁচা দিল।···হুঁউ। ঠিক তোর মতো। শাট আপ!

গুণমালার জীবনে একটা সংকট এসেছিল। কুতুবগঞ্জ না গ্রাম, না শহর—অথবা একই সঙ্গে শহর এবং গ্রামও। একটুতেই তিল তাল হয়ে ওঠে। পাটোয়ারিজীর মুসলিমপ্রীতির বদনাম ছিলই দেশ ভাগের আগেও পরেও। এই যে কাজিসায়েবের মেয়েকে স্কুলে চাকরি দেওয়া থেকে এ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমিসট্রেস করে তোলার ব্যাপারে আড়ালে অনেক নিন্দামন্দ মেশানো কানাঘুঁসো হয়েছে। তার সঙ্গে তাঁর মেয়ে গুণমালার ব্যাপারটা প্রায় ঢি ঢি ফেলে দিয়েছিল। গতিক দেখে পাটোয়ারি মেয়েকে কলকাতা পাঠিয়ে দেন। সেখানেই বিয়ে হয়ে যায় গতবছর। বিয়ের অনেক পরে গুণমালা মধ্যে মাঝে দু-চারদিনের জন্যে বাপের বাড়ি আসে। হঠাৎ আসে, হঠাৎ ফিরে যায়।

গুণমালা শাট আপ বলেই হেসে উঠেছিল। বলল, আমার মতো মানেটা কী? তুই তো জানিস সব। জানিস না রাণু?

রাণু দুষ্টুমি করে বলল, আমি এসব ব্যাপারে খুব আনাড়ি রে! কিছু বুঝি না।

হু উ। ডুবেডুবে জল খাও। নিশ্চয় কাউকে জুটিয়ে বসে আছ।

গুণমালা মুঠো খুলে চকোলেট দেখাল এবং জোর করে রাণুর মুখে গুঁজে দিয়ে নিজে একটা চুষতে থাকল। এইসব সময় রাণুর মনে একটা আবেগ আসে। স্মৃতির আবেগ। ডাইনে স্কুলবাড়ির মারবেলে বাঁধানো ধাপ, তার ওপর বড় বড় দুটো থাম। বিশাল কপাটে মস্ত তালা ঝুলছে। বাঁদিকের বাড়িটায় কয়েকজন দিদিমণি সপরিবারে থাকেন। তারপর সামনে খেলার মাঠ। তার ধার ঘেঁষে গঙ্গার পাড় দিয়ে এগিয়েছে এবড়োখেবড়ো খোয়া ঢাকা রাস্তা। দু'ধারে প্রাচীন পামগাছের সার।

রাণু মোয়াজ্জেমের কথা ভাবছিল। আবু খোনকারের ছেলে মোয়াজ্জেম এখন চোখে সানগ্লাস পরে হিরো সেজে মোটর সাইকেল হাঁকিয়ে বেড়ায়। ওর বড়ভাই এলাকার রাজনৈতিক নেতা। গত নির্বাচনে এম এল এ হয়েছেন ভদ্রলোক। ওঁর ভাই বলে খুব বেঁচে গিয়েছিল মোয়াজ্জেম। তবে ব্যাপারটা একেবারে মিথ্যাও ছিল না।

গুণমালা যে প্রায়ই রাণুদের বাড়ি যেত, তার কারণ তো রাণুর অজানা ছিল না। ছোট্ট পুকুরের ওপারে গাছপালার মধ্যে খোনকার বাড়ি। জমিজমা আর ব্যবসা দুদিক থেকেই আয় ওঁদের আভিজাত্য নিটোল রেখেছে চিরদিন। বাড়ির পেছনে আগাছার জঙ্গল পেরুলে রেল-লাইন। তারপর পোড়ো জমির শেষে গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে। একদিন রাত করে হঠাৎ কোত্থেকে গুণমালা এসে বলেছিল, আমায় বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আয় না রাণু! গুণমালার চেহারায় কী একটা ছিল : ঝড়বৃষ্টি খাওয়া গাছের মতো। ওর গলা কাঁপছিল কথা বলতে। রাণু টের পেয়েছিল একটা কিছু ঘটেছে। কিন্তু রাণুর স্বভাবটাই অন্যরকম। মাথাঠাণ্ডা রেখে একটি কথাও জিগ্যেস না করে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিল। সারাপথ গুণমালাকেও কেমন চুপচাপ আর ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। দরজার কাছে পৌঁছে রাণু শুধু বলেছিল, বোকার মতো কাজ করিসনে। কক্ষনো না।

গুণমালা কোনো কথা বলেনি। সোজা বাড়ি ঢুকেছিল, মুখটা নিচু।

অনেক পরে রাণুকে গুণমালা আবছাভাবে একটা বিবরণ দিয়েছিল। গঙ্গার ধারে মোয়াজ্জেমের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হয়ে গেছে তার। গুণমালা ওকে নিয়ে চলে যেতে চেয়েছিল কোথাও। মোয়াজ্জেম তাতে রাজি হয়নি। সে গোঁয়ার ছেলে। পাটোয়ারিজীর মেয়েকে কলমা পরিয়ে ঘরে ঢোকালে কার সাধ্য গণ্ডগোল বাধায়? তার বড়ভাই রাজনীতির পাণ্ডা। থানা পুলিশ নাকি তার হাতে। কিন্তু বুদ্ধিমতী গুণমালা এতে কান দেয়নি। প্রেমিককে নিয়ে দূরে চলে যেতে সাধ ছিল তার।

প্রেম-ট্রেম কেন যেন কিছুতেই চাপা থাকে না। কুতুবগঞ্জে অনেক প্রেম রাণু দেখেছে! দেখতে দেখতে সে হয়তো 'বড়দি' হেডমিসট্রেস মিস জয়ন্তী সান্যালের মতো বুড়ি হয়ে যাবে। কিন্তু কোনো পুরুষ-মুখের দিকে তাকিয়ে কেন তার মনে হয় না, এ ভদ্র-লোকের প্রেম-ট্রেম পেলে মন্দ হত না? রাণু মনে মনে হাসে।

গল্প উপন্যাস পড়তে গিয়ে প্রেম এলেই সে চটে যায়। সত্যি কি প্রেম বলে কিছু আছে? পুরুষমানুষ মেয়েমানুষের শরীর করায়ত্ত করতে চায় বলেই তো এত সব ফন্দি,ন্যাকান্যাকা কথা। গুণমালাটা ভীষণ বেঁচে গেছে। মোয়াজ্জেম এখন গঞ্জের সেরা মাতাল। জুয়ো খেলে। লাম্পট্যেও নাকি তার জুড়ি নেই। ত'ছাড়া ধরা যাক, কলমা পরে বড়বিবি সেজে গুণমালা খোনকার বাড়ি ঢুকলে পাটোয়ারিজী কিংবা হিন্দুসমাজ মুখ বুজে থাকত—কিন্তু গুণমালার অবস্থাটা কী হত খোনকারবুড়ির পাল্লায় পড়লে? কড়া পর্দার মধ্যে দিন কাটাতে হত বেচারীকে। খিড়কির দোরে উঁকি মারতেও মানা। তার ওপর ধর্মের নামে একশো বাতিক। কাজিবাড়ির মেয়েরা বেপর্দা হয়ে ঘোরে। স্কুল কলেজে পড়ে। পরপুরুষজনের সঙ্গে মেলামেশা করে। খোনকার আর তাঁর বিবিসায়েবা তাই নিয়ে পাড়ায় কম কুৎসা রটাননি। এখনও রটানোতে ভাঁটা পড়েনি। রাণুর বিয়ের কথা উঠলেই ওঁরা ভাংচি দিয়ে ভণ্ডুল করতে চিতাবাঘের মতো আড়ালে ছটফট করে বেড়ান।

রিকশো থামলে রাণু টের পেল, গুণমালা কলকাতার গপ্প করছিল। একটা কথাও কানে ঢোকেনি। গুণমালা নেমে গেল আগে। রাণুর না-শোনা কথার জের টেনে বলল, দেয়ালীতে ওরা সবাই আসতে চেয়েছে এখানে। সব কিন্তু বোমবের মাল, বুঝলি রাণু? ভীষণ ডাঁট। তিন-চারটে গাড়ি করে আসবে সেই আমেদাবাদ থেকে।

রাণু রিকশোওলা সালামকে বলল, তুমি অপেক্ষা করবে সালাম-ভাই?

সালাম মাথা দোলাল। কিন্তু গুণমালা বলল, ওকে আটকাসনে রাণু। আমরা ঘুরব আজ।

একতালা ছড়ানো-ছিটানো বাড়ি হয়েছে অনেকগুলো এই এলাকায়। বড়দি গঙ্গার ধারেই জায়গা কিনেছিলেন।

কিনেছিলেন। পাটোয়ারিজীর সহায়তায় বাড়ি ঝটপট হয়ে

গেছে। রাস্তার ধারে ছোট্ট কাঠের গেট। ফুলবাগিচা আর সব্জি ক্ষেত। সুন্দর লন। জয়ন্তী বারান্দায় বসে বই পড়ছিলেন। দেখে মুখ তুলে তাকিয়ে আছেন। মুখে হাসি।

ওটা কে ? গুণমালা না ?

গুণমালা দৌড়ে গিয়ে পায়ের ধুলো নিল। বলল, কাল রাতে এসেছি বড়দি।

জামাইবাবু আসেনি ?

গুণমালা ঘাড় নাড়ল।

জয়ন্তী বললেন, যাও। ঘর থেকে মোড়া নিয়ে এস। রাণু, এসে ভালই করেছ। একটু আগে ভাবছিলাম, তোমাকে খবর পাঠাব।

গুণমালা দুটো মোড়া আনল। রাণু বলল, আপনি দার্জিলিং যাবেন বলেছিলেন! কবে যাচ্ছেন জানতে এলাম।

জয়ন্তী একটু হাসলেন।···যাবে নাকি আমার সঙ্গে ? কিন্তু আমার তো রিজারভেশান হয়ে গেছে। আগে বললে··

গুণমালা বলল, রাণু দার্জিলিং যাবে কী বড়দি, ও যাবে মক্কা।

মক্কা! জয়ন্তী উঠে দাঁড়ালেন। রাণু বুঝি মক্কা যেতে চাইছে ? ভালই তো। তীর্থ করে আসবে।

ভেতরে চলে গেলেন জয়ন্তী। রাণু বলল, বড়দি, চা-ফা খাবো না কিন্তু।

কোনো জবাব এল না। জয়ন্তী একা থাকেন। মাঝে মাঝে ওঁর আত্মীয়স্বজন এসে থেকে যায়। মাথার চুলে এখনও পাক ধরেনি, কিন্তু শরীর ভারি হয়ে গেছে। আস্তে সুস্থে চলাফেরা করেন। রাণুর প্রতি স্নেহটা অন্য টিচারদের ঈর্ষার বিষয়। এ নিয়েও আড়ালে অনেক নিন্দামন্দ রটানো হয় রাণু যেমন জানে, উনিও জানেন। এমন কী রাণুকে এ্যাসিসট্যানট হেডমিসট্রেস করা হলে রটে গিয়েছিল, জয়ন্তী পাকিস্তানে থাকার সময় নাকি মুসলমান প্রেমিক ছিল। দেশভাগ মানুষের মনটাকে এখনও কত বিষিয়ে

রেখেছে, রাণু টের পায়। কুতুবগঞ্জে কখনও সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বাধেনি। হাল আমলের রাজনীতিতে অনেক ক্ষেত্রে মুসলমানরাই নেতৃত্ব করছে। অথচ কোনো কোনো মুহূর্তে সেই বিষের ঝাঁঝালো গন্ধ বেরিয়ে আসে। রাণুর যে এত মেলামেশা সারাজীবন হিন্দুদের সঙ্গেই বেশি—অথচ রাণু সেইসব মুহূর্তে আচমকা টের পেয়ে যায়, তাকে মুসলমান ছাড়া ওরা আর কিছু যেন ভাবতে পারছে না। রাণু তো এমন করে ভাবে না। তার মাথায় হিন্দু-মুসলমান নেই। মানুষ আছে। হয়তো বা সে মানুষ হীনচেতা, স্বার্থপর, অজ্ঞ, বোকা, একচোখো—তবু মানুষ। খানাবাহাদুরের মতো তাঁর ছেলে মবিনুলও বলেন, ধর্ম নিয়ে ধুয়ে খাব? সময়ের তালে তাল মিলিয়ে চলাটাই বড় কথা। আমার ভাইঝিরা এখন বাংলাদেশে বড় বড় পোসটে চাকরি করে। রাণু-বুলিকে সেই লাইনে মানুষ করেছি।…

জয়ন্তী ফিরে এলেন একটা খাম হাতে নিয়ে। তোমার সঙ্গে জরুরী কথা আছে এই চিঠিটার ব্যাপারে। একটু বসো। আর গুণমালা, তখন যেন কী বললে? রাণু মক্কা যাবে না কী…

গুণমালা বলল, হুঁউ বড়দি। জানেন না, ওর বোন বুলি আগেই সেখানে চলে গিয়ে ওর জায়গা করছে। রাণু কিন্তু আরবের শেখের বউ হবে। এমন শেখ, যার নিজের প্লেন আছে।

রাণু বলল, বিয়ে হয়েও তুই বাচাল থেকে গেলি গুণমালা? বড়দি না থাকলে তোকে গঙ্গায় ফেলে দিতাম।

জয়ন্তী চিঠিটা মুঠোয় রেখে বললেন, ও হ্যাঁ। বুলি দেখা করতে এসেছিল বরকে নিয়ে।

এসেছিল নাকি? রাণু চমকে উঠেছিল। বলেনি তো বুলি! যাবার আগের দিন দুজনে সেজেগুজে বেরিয়েছিল বটে। রাণুকে ডেকেছিল শাহাবুদ্দিন। রাণুর মনে হয়েছিল, দুজনেই ঘুরুক বরং। সঙ্গে থেকে ওদের সুখে বাধা দেওয়াটা ঠিক নয়।

জয়ন্তী বললেন, জামাইবাবুটি অসাধারণ ভদ্রলোক বলে মনে হল। ভারী নম্র ব্যবহার। দেখো, মেয়েটা সুখী হবে, আমি

বলছি। সেদিন অনেক বিষয়ে আলোচনা হল। খুব খোঁজখবর রাখে বুলির বর। ছাত্র হিসেবেও ব্রিলিয়ান্ট ছিল মনে হল। অবশ্যি···জয়ন্তী হাসলেন। অবশ্যি, বুলির চেয়ে গায়ের রঙটা একটু ময়লা।

রাণু বলল, একটু কেন, অনেক। তাছাড়া বয়সটাও···

ঝোঁকের মুখে কথাটা বলে হঠাৎ চুপ করে গেল রাণু। জয়ন্তী বললেন, পুরুষমানুষের বয়স-টয়স কোনো ফ্যাক্টর নয়। খুব ভাল লাগল, সত্যি। তোমার বাবার সঙ্গে দেখা হলে নানা কথা আলোচনা করেন। তোমাদের সমাজেও আমাদের এভিলটা ঢুকেছে। একই প্রবলেম!

বাচাল গুণমালা বলল, ও বড়দি! আপনি কোন প্রবলেমের জন্যে বিয়ে করেননি?

জয়ন্তী হাত তুলে বললেন, পুঁচকে মেয়ের মুখে কত বড় কথা! এই সেদিন তুই ফ্রক পরে স্কুলে আসতিস।

গুণমালা তক্ষুণি কাঁচুমাচু মুখে বলল, সরি বড়দি! ক্ষমা চাইছি।

জয়ন্তী চিঠিটা রাণুর দিকে এগিয়ে দিলেন। রাণু ভয়ে ভয়ে চিঠিটা নিল।

জয়ন্তী বললেন, চিঠিটা সময় করে ভালভাবে পড়ে দেখবে রাণু। তারপর তোমার যা মনে হয়, নিঃসংকোচে আমাকে জানাবে। আমি সামনের শুক্কুরবার সন্ধ্যার ট্রেনে দার্জিলিং চলে যাচ্ছি।

রাণু টের পেল কী এক অস্বস্তি তাকে জড়িয়ে ধরেছে। বুকের ভেতরটা চুপিচুপি কাঁপছে। এ কার চিঠি, খামের ওপর তাকিয়ে সেটা দেখতেও সাহস হচ্ছে না। জিগ্যেস করতেও পারছে না।

গুণমালা করুণ মুখে বলল, আমায় উপর রাগ করলেন বড়দি?

জয়ন্তী ওর চুল টেনে দিয়ে হাসিমুখে বললেন, এখন তুই গৃহিণী-মানুষ। তোর ওপর রাগ করবে কী? তোর প্রশ্নটা খুব স্বাভাবিক গুণমালা। কিন্তু জানিস? আমি নিজেও জানি না প্রবলেমটা কী ছিল আমার?

রাণু ঘড়ি দেখে বলল, এই রে! ব্যাংকে যেতে হবে আমাকে। বড়দি, উঠি।

জয়ন্তী বললেন, একটু বসো। কমলা আম কাটছে। দু'টুকরো খেয়ে যাবে।···

বুলিরা চলে যাওয়ার পরে ঘরে একটা অচেনা অদ্ভুত গন্ধ রাণুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে একটা হামলা, তারপর সে বুঝতে পারে কোথাও ভুল হচ্ছে যেন। সেকেলে ছপ্পর খাটের ওপর দুই বোন পাশাপাশি কত হাজার রাত কাটিয়ে অবশেষে একটা ঘটনা ঘটল। এখনও অবিশ্বাস্য মনে হয় রাণুর। বিছানার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ মনে হয়, সহস্র আরব্য রজনীর একটি রজনী কোন ফাঁকে এসে গিয়েছিল, ওখানে তার চিহ্ন। একজন কালো দৈত্য এবং এক সাদা পরী পাশাপাশি শুয়েছিল। বিছানা গোছগাছ করতে এসে রাণু একলা ঘরে দীর্ঘ দু'মিনিট তাকিয়েছিল বিছানাটার দিকে। কেউ দেখে ফেললে কী যে ভাবত!

ব্যাংক থেকে টাকা তুলে মোহনলাল বস্ত্রভাণ্ডারে সুন্দর একটা জয়পুরী চাদর কিনে বিছানাটা বদলানোর জেদ চড়েছিল। ঘরটা নতুন করে গোছানো হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। নতুন চাদরে বিছানা ঢেকে সে চিত হয়ে শুয়ে সেদিন সারা বিকেল ভেবেছে, সহস্র রজনীর এক রজনী তার জীবনেও কতবার আসন্ন মনে হয়েছে। অথচ শেষ পর্যন্ত কিছু ঘটেনি।

বড়দির দেওয়া চিঠিটা রাণু নিঃসংকোচে আব্বার হাতে তুলে দিয়েছে। একটা নিরীহ চিঠি তাকে কী ভয় পাইয়ে দিয়েছিল, বলার নয়। গুণমালার জ্বালায় ফেরার পথেই পড়তে হয়েছিল চিঠিটা। নৈলে রাণু অনেকটা সময় নিত। তার অস্বস্তি হচ্ছিল এই ভেবে, বড়দির কাছে কেউ বেনামী চিঠি লিখে তার নামে বুঝি মিথ্যে কেলেংকারির নালিশ তুলেছে। অংকের টিচার শোভাদির নামে একসময় বেনামী চিঠি আসত। বড়দির কাছেও শোভাদির

কুৎসা করে কেউ চিঠি লিখত। তা দিয়ে থানাপুলিশ করার মানে হয় না। একসময় ব্যাপারটা নিজে থেকে থেমে গিয়েছিল।

গুণমালা বলেছে, চোখ বুজে ঝুলে পড় রাণু। এমন চান্স আর পাবিনে।

রাণু বলেছে, তোর মাথা খারাপ? চিঠিটা কত গোলমেলে দেখলিনে?

কিচ্ছু গোলমেলে নয়।

নয়? রাণু সন্দিগ্ধ হয়ে বলেছে। প্রথম কথা, সোজা বাবার কাছে এ্যাপ্রোচ করতে পারতেন ভদ্রলোক। তা না করে বড়দিকে ধরলেন কেন?

বড়দির সঙ্গে চেনাজানা আছে বলে।

আচ্ছা, আচ্ছা। তাই হল। কিন্তু 'অসংখ্য অনিবার্য কারণে এতদিন বিয়ের দিকে মন দেওয়া হয়নি'—এর মানেটা কী? নিশ্চয় কোনো গণ্ডগোল আছে।

যাঃ! তুই বরাবর বড্ড সন্দেহপ্রবণ রাণু! সন্দেহই তোকে খাবে দেখবি।···

গুণমালা হয়তো ঠিকই বলেছে। কিন্তু রাণুর সহজাত বোধ রাণুকে বিব্রত করেছে। খালি মনে হচ্ছে, কোথাও একটা অস্বাভাবিকতা আছে চিঠিটাতে। ইসলামপুর এখান থেকে মাইল পনের দূরে। সেখানকার কলেজের বাংলার লেকচারার কোনো এক মোজাম্মেল হক চল্লিশ বছর বয়সেও অবিবাহিত রয়েছেন, এটা আর যে বিশ্বাস করবে করুক, রাণু করে না। তার ধারণা, হিন্দুদের বেলায় এমনটা খুব স্বাভাবিক হতে পারে। মুসলিমদের বেলায় অস্বাভাবিক।

কাজিসায়েব চিঠিটা পড়েই বড়দির কাছে দৌড়ে গিয়েছিলেন। ফিরে এলেন সন্ধ্যা গড়িয়ে। রাণু তখন বারান্দার মেঝেয় পা ছড়িয়ে বসে এদিনের কাগজ পড়ছে। কাগজ কলকাতা থেকে বিকেলের ট্রেনে পৌঁছয়। হাতে আসে ছ'টা নাগাদ।

হেরিকেনের আলো জ্বলছে বারান্দায়। জোহরা যথারীতি রান্না-ঘরে। ময়নার মা থামে হেলান দিয়ে ঢুলছে। ভাত-তরকারি পেলে ন্যাকড়ায় থালাটা বেঁধে বাড়ি ফিরবে।

কাজিসায়েব রাণু বলে ডেকেই ময়নার মাকে দেখে চুপ করে গেলেন। ব্যস্ত হয়ে যা বলতে যাচ্ছিলেন, এখন বলা যাবে না। রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন।

তার ফলে ময়নার মায়ের রাতের খাদ্যটা তাড়াতাড়ি জুটে গেল। বুড়ি ন্যাকড়ায় বাঁধা খাদ্য কাঁখে যত্ন করে নিয়ে একটা মোটা শুকনো কঞ্চির লাঠি ঠুকঠুক করতে করতে বাড়ি ফিরবে আগাছার জঙ্গল দিয়ে।

রাণু জানে, এবার আব্বা একটা সভা বসাবেন। বারান্দার মাঝামাঝি খানিকটা অংশ উঠোন অব্দি এগিয়েছে। সেটা বিলিতী পার্লার বলা যায়। সেখানে খোলা আকাশের নিচে চেয়ার পেতে বসে রাত-আকাশ দেখেন মবিনকাজি।

কই গো, রান্নাঘর ফেলে এবার একটু এসো। কাজিসায়েব ডাকলেন। রাণু, এখানে আয় মা।

রাণু কাগজে চোখ রেখে বলল, বড়দির সঙ্গে দেখা হল?

হল। তারপর গেলাম পাটোয়ারিজীর কাছে। ওনার সঙ্গেও কথাবার্তা বললাম। কাজিসায়েব স্ত্রীর উদ্দেশে চড়া গলায় বললেন ফের, ওই রান্নাঘরেই তোমার জান যাবে। সারাক্ষণ ওখানে ঢুকে কী যে করো বুঝিনে!

জোহরা লম্প হাতে বেরিয়ে বললেন, ওই জাহান্নামে না ঢুকলে যে মিয়াদের পোলাও কোর্মার ঢেকুর উঠবে না। ঢুকে কী করি? নিজের কলজে সেদ্ধ করি, জানো না?

কাজিসায়েব অন্য সময় হলে চটে যেতেন। এখন মুডটা ভাল রাখতে চান। হাসতে হাসতে বললেন, ও তোমার অভ্যেস!

লম্পটা রান্নাঘরের বারান্দায় রেখে উঠোনে নামলেন জোহরা। রাণু আব্বার দিকে তাকিয়ে আছে। হেরিকেনের আলোর ছটা

পড়েছে কাজিসায়েবের গায়ে। মুখটা আবছা। চিবুকের দাড়িটুকু ইদানীং সুন্দর তিনকোণা করে ছাঁটেন। জামাইয়ের আনা বিশুদ্ধ আরব্য সুর্মাও টানেন চোখে। আগে এটুকু মুসলমানীও ছিল না। যৌবনে তো দাড়িই রাখতেন না। মাঝে মাঝে ধুতি পরতেন। বয়স হয়ে অল্পস্বল্প ধর্মভাব হয়েছে। গোড়ালির ওপর তোলা পাজামা পরেন। জুম্মার দিন মসজিদে নমাজ পড়তে যান। বাড়িতেও সকাল-সন্ধ্যা নমাজ পড়েন।

জোহরা উঠোনে দাঁড়িয়ে রইলেন। কাজিসায়েব বললেন, রাণুর বড়দির জানাশোনা ছেলে। মা-বাপ নেই। তিন ভাই। উনি ছোট। বাকি দু'ভাই চাষবাস দেখাশোনা করেন। তাঁদের বিয়ে-শাদি হয়ে গেছে।

এ পর্যন্ত শুনেই জোহরা বললেন, অত ভক্তি করে লিখেছে শুনেই বুঝেছিলাম। সেই চাষাভুষোর ঘর।

কাজিসায়েব চটে গেলেন। থামো তো! আর মোখাদেমি (আভিজাত্য) দেখিও না। ইসলামে জাতিভেদ নেই। ছেলে কলেজের অধ্যাপক। এম এ পাশ।

রাণু আস্তে বলল, লেকচারার। অধ্যাপক না।

কাজিসায়েব কান দিলেন না। বললেন, পাটোয়ারিজীও চেনেন বললেন। ইসলামপুরেও দাদনের কারবার আছে পাটোয়ারিজীর। পাটের দাদন আর কী! সেই সূত্রে ছেলের বড়ভাইদের চেনেন।

জোহরা শান্তভাবে বললেন, এতদিন বিয়েশাদি না করার কারণ কী? কেমন খটকা লাগছে।

খটকা নিয়েই থাকো মা-বেটিতে! কাজিসায়েব বিরক্ত হয়ে বললেন। এ যুগে এরকম হয়েছে। বুঝলে? তাছাড়া ভাল করে খোঁজখবর না নিয়ে তো কিছু হচ্ছে না। হেডমিসট্রেস অবশ্য জোর গলায় বললেন, ছেলে খুব ভাল। তবে একটু খেয়ালি ধরনের নাকি। চিঠি পড়েও তাই মনে হল।

জোহরা বললেন, শাহাবুদ্দিনের বয়সী। চল্লিশ লিখেছে না? -

হ্যাঁ। বয়স-টয়স ছাড়ো তো? বুলির বেলায় তুমি ওই ফ্যাকড়া তুলেছিলে। কাজিসায়েব খিকখিক করে হাসলেন। বয়স কোনো কথা নয়। তাছাড়া হেডমিসট্রেস বললেন, খুব সুপুরুষ স্বাস্থ্যবান ছেলে। রাণুকে দেখেছেও। দেখেই তো পছন্দ করে গেছে। খোঁজখবর নিয়েছে। তারপর মনস্থির করে চিঠি লিখেছে।

রাণু বলল, রবীন্দ্র জয়ন্তীতে ··

সে থেমে গেল হঠাৎ। কাজিসায়েব বললেন, কী?

রাণু মুখ নামিয়ে বলল, হুঁ, মনে পড়ছে। রবীন্দ্র জয়ন্তীতে এসেছিলেন ভদ্রলোক।

কাজিসায়েব খুশিতে ফেটে পড়ে বললেন, তাহলে তো রাণুও দেখেছে। কী আশ্চর্য, কী আশ্চর্য! চিঠি পড়েও সেটা মনে আসেনি? আমার দুই মেয়েই যেন কেমনধারা। বুলিরও এই স্বভাব। এত ভুলো মন হলে কি চলে?

রাণু আসলে খুব খুঁটিয়ে চিঠিটা পড়েনি। চোখ বুলিয়ে নিয়েছিল দ্রুত। তার হাত কাঁপছিল কেন সে জানে না। গুণমালাও পড়েছিল। কিন্তু রাণুকে ভদ্রলোক দেখেছেন, একথাটা দুজনেরই কী ভাবে চোখ এড়িয়ে গেছে নিশ্চয়। এখন চিঠিটা পেলে রাণু খুব খুঁটিয়ে পড়বে।

রাণু কাগজে চোখ রেখেছে ফের। কিন্তু কিছু পড়ছে না। গত মাসের রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠানটা তার চোখে ভাসছে। খুব ব্যস্তভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিল সে। একবার ডায়াসে একবার বাইরে। বক্তাদের দিকে তত চোখ ছিল না, বক্তৃতাও ভালো করে শুনছিল না। আবৃত্তি, গান, নাচের প্রোগ্রাম তখন তার মাথায়। মেয়েগুলোকে নিয়ে ব্যস্ত। ওই সময় কোন কলেজের কোন অধ্যাপক কী বলছেন, শোনার মন থাকে না।

এসব অনুষ্ঠানে হিন্দু-মুসলিম বক্তাও অনেক জুটে যান। রাজনীতিওলাদেরও ডাকতে হয়। ফলে প্রোগ্রাম হয় ভীষণ লম্বা-চওড়া। বুলি সমাপ্তি-সঙ্গীত গাইল, তখন রাত দশটা।

তাহলে ভদ্রলোক তাকে দেখেছেন। রাণু আড়ষ্ট হয়ে উঠল। ভদ্রলোকের চেহারাটা স্পষ্ট মনে পড়ছে না। স্মৃতিটা বেশিদিনের নয় অথচ ঘুলিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্য লাগছে, অধ্যাপক বা লেকচারার যাই হোন, ইসলামপুর কলেজের মোজাম্মেল হক ভাষণ দিলেন, অথচ সে খেয়াল করল না কেন?

কাজিসায়েব বললেন, এতদিন বিয়েশাদি করেনি—এতে আমারও একটু খটকা লেগেছিল বইকি। হেডমিসট্রেস বললেন, উপযুক্ত কোয়ালিফায়েড মেয়ে পায়নি বলেই করেনি। এখন খোঁজ পেয়েছে, তাই লিখেছে। খুব খাঁটি কথা।

জোহরা বললেন, তাহলে যাও একবার। দেখে-টেখে কথাবার্তা বলে এস।

কালই রওনা হব। কাজিসায়েব গলাচেপে বললেন। আগে একা যাই তো!

রাণু হঠাৎ মুখ তুলে বলল, আমি কিন্তু চাকরি ছাড়ব না আব্বা।

তা বললে কি চলে মা? কাজিসায়েব সস্নেহে বললেন। যদি দামাদমিয়া আপত্তি করে?

জোহরা বললেন, আজকাল স্বামী-স্ত্রী দুজনেই তো চাকরি করছে। শাহাবুদ্দিন বলে গেল, বুলির চাকরির ব্যবস্থা করবে। রাণুও তাই করবে। ইসলামপুরে মেয়েদের স্কুল কি নেই, কলেজ আছে যখন?

জানি না। থাকলেও টিচারের পোস্ট খালি আছে কি না, সেও কথা। যাই আগে, দেখেশুনে কথাবার্তা বলে তো আসি। কাজিসায়েব আড়ামোড়া দিলেন। কই, ভাত বাড়ো। খেয়ে-দেয়ে সকাল-সকাল শুয়ে পড়ি। ভোরবেলা বেরুব।

রাণু ঘরে গিয়ে ঢুকল। টেবিলে নীল রঙের সুদৃশ্য শেড দেওয়া কেরোসিনবাতি জ্বলছে। খাটে পা ঝুলিয়ে বসল সে। ইসলামপুর কলেজের বাংলার লেকচারার মোজাম্মেল হককে খুঁজতে থাকল রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠানের স্মৃতির ভেতর। আবছা একটা চেহারা

মাত্র। অনেক চেষ্টা করেও তাতে কোনো রূপ ফুটল না। বিমূর্ত ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার অসহ্য লাগল। এমন করে অনেকবার সে অনেক বিমূর্ত পুরুষের ছবির দিকে তাকিয়ে থেকেছে—যতবার আব্বা একটা করে বরের খোঁজ পেয়ে ছোটাছুটি করেছেন। বুলি রাণুকে প্রতিবার এমনি একলা হয়ে চুপচাপ বসে থাকতে দেখলে পিছনে লেগেছে। আপা, তুই কী ভাবছিস বলতে পারি।

কী ভাবছি?

হবু-ছুলাভাইকে।

বুলি, মারব বলছি। বাজে বলিসনে।

রাণু বোনকে তেড়ে যেত বটে, কথাটা তো সত্যি। অন্য মেয়েরা কী করে জানে না রাণু, বুলির বেলাতে অবশ্য বুলির আচরণে তেমন কিছু দেখেনি, কিন্তু নিজের বেলায় রাণুর এটা হয়। বিয়ের কথা উঠলেই সে একটা পুরুষমানুষকে নির্জনে সামনে দাঁড় করায়। কত কী এলোমেলো ভাবে। এমন কী, তার সঙ্গে তর্কবিতর্কও করে।

নাজিমের গলা শোনা গেল বাইরে ···যা বাবা? বাড়ি যে 'আঁধারমণিক-পাঁচকেঠে' হয়ে আছে!

রাণু জানে, কথাটা ছুটো গাঁয়ের নাম। নাজিম যতদিন ট্রাক ড্রাইভার হয়েছে, নানা জায়গা যাতায়াত করছে, ততদিন তার এমনি একেকটা উপমা শোনা যাচ্ছে। মা বকবক করছে শুনলে সে বলে, যা বাবা! এ যে 'বকখালি'র হাট বসালে দেখছি!

রাণু বেরিয়ে গিয়ে বারান্দার হেরিকেনের দম বাড়িয়ে বলল, এত সকাল সকাল ফিরলি যে আজ? গাঁজার আসর বুঝি জমেনি?

নাজিম হাসল।·· রাণু তুই মাইরি আমাকে গাঁজার আসরে না ঢুকিয়ে ছাড়বিনে।

বাকি আছে বুঝি? রাণু হেরিকেনটা এগিয়ে খোলা জায়গাটায় রাখল।

নাজিম কথায় কান দিল না। একটা মস্তো প্যাকেট বাড়িয়ে

দিয়ে বলল, ধুলিয়ানের দিকে গিয়েছিলাম। কত বড় বড় লিচু এনেছি দ্যাখ! বাগান থেকে টাটকা ভেঙে দিয়েছে।

রাণু প্যাকেটটা নিল। রান্নাঘরের বারান্দায় লম্পের আলোয় কাজিসায়েব খেতে বসেছেন। বললেন, নাজু এলি নাকি?

জী। নাজিম সংক্ষিপ্ত সাড়া দিয়ে তার ঘরে ঢুকল। টর্চ বের করে এনে উঠোনে আলো ফেলে বলল, রোজ ভুলে যাই টর্চ নিতে। রাণু, বাইরে গেস্ট দাঁড় করিয়ে রেখেছি। দলিজঘরে একটা আলো চাই।

রাণু বলল, আবার কাকে জোটালি?

তুই চিনবিনে।…বলে সে বারান্দার শেষ দিকে দলিজঘরের দরজার দিকে এগোল। সেখান থেকে ফের বলল, আলোটা নিয়ে আয় না বাবা! দাঁড়িয়ে কী করছিস?

রাণু গম্ভীর মুখে হেরিকেনটা নিয়ে গেল। তারপর দরজার সামনে রেখে চলে এল। নাজিম ভেতরে গিয়ে বাইরের কপাট খুলে দিচ্ছে। এভাবে মেহমান আনাটা ওর পক্ষে নতুন কিছু নয়।

জোহরা বললেন, কী বলছে রে নাজু?

রাণু বলল, ওর গেস্ট এসেছে। নাও, এখন ঠ্যালা সামলাও তোমার আদরের বেটার। এক্ষুণি এসে বলবে, মুর্গি জবাই করো।

কাজিসায়েব গুম হয়ে গেলেন। চুপচাপ খেতে থাকলেন।

রাণু লিচুর প্যাকেটটা নিয়ে মায়ের কাছে গেল। জোহরা প্যাকেট থেকে লিচু বের করে মিষ্টি হাসলেন। তাও তো নাজু বাইরে থেকে এটা-ওটা হাতে করে বাড়ি ঢোকে। এই এনেছে বলে বছরকার ফলটা চোখে দেখতে পেলাম। আর কারুর তো মনে থাকে না আনতে।…

চার

নাজিমের 'গেস্ট'দের ব্যাপারে রাণুর ঔৎসুক্য থাকে না। যেটুকু বাড়তি ঝামেলা হয়, জোহরা সামলান। নাজিমও তখন উদার

হাতে পয়সা খরচ করে। রাণু জানে ওর 'গেস্ট' কারা। ট্রাক চালিয়ে কোথায় কোথায় যায় আর কার সঙ্গে বন্ধুতা হয়। তাকে জুটিয়ে নিয়ে আসে। ভাগ্যিস, নাজিমের অবসর কম। পারুল ট্রানসপোরটের কাজকর্ম দিনে দিনে বাড়ছে। এদিকে নাজিমও ট্রাক চালানোর নেশায় পড়ে গেছে যেন। বেশিক্ষণ বাড়িতে থাকে না।

কাজিসায়েবও এড়িয়ে চলেন ছেলের বন্ধু বা অতিথিদের, যেই আসুক। দলিজঘরে তখন ঢোকেন না। পারতপক্ষে নেহাত ঢুকতে হয় হোমিওপ্যাথি ওষুধের বাকসোটা আছে বলে। বাকসোটা গম্ভীর মুখে বাইরের বারান্দায় নিয়ে যান। নাজিমের গেস্ট সম্ভাষণ জানালে অবশ্য গলার ভেতর থেকে সাড়া দেন।

আড়ালে নাজিম বলে, আব্বা ভাবছেন বুঝি আমার মতো কোন আজেবাজে লোক এসেছে। চেনা-পরিচয় দিলে চোখ কপালে উঠবে। এ নাজু যার-তার সঙ্গে ভাব করে না।

রাণু বলে, থাম থাম। তোর ইয়ারবন্ধু কারা সবাই জানে। হয় সেই কাশেম জুয়াড়ী, নয় তো মোয়াজ্জেমের মতো কোন হারামজাদা।

নাজিম চোখ নাচিয়ে বলে, হারামজাদা? সামনাসামনি বলে দেখিস না।

হুঁ, আমার গর্দান নেবে।

আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি, অতটা পারবে না। তবে মোয়াজ্জেমকে অত তুচ্ছ করিসনে। তোর প্রাণের বন্ধু ওর জন্যে জান দিতে গিয়েছিল। মনে রাখিস।... বলে নাজিম কেটে পড়ে।

রাণু খোঁচা খেয়ে চটে যায়। গুণমালার ব্যাপারটা মনে পড়ে যায়। গুণমালার ওপরেও খাপ্পা হয়ে ওঠে। অর্ধশিক্ষিত মস্তানমার্কা একটা ছেলের প্রেমে পড়েছিল বড়লোকের আদুরে মেয়েটা। কী অবস্থা হত, ভাবতেও বুক কাঁপে।

ভোরবেলা থেকে আকাশ মেঘলা। শেষরাতে কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি ঝরেছিল। আবহাওয়ায় ঠাণ্ডা আমেজ এসেছে। কাজিসায়েব

ভোরের নমাজ পড়ে চা-নাশতা খেয়ে স্কুটারে চেপে বেরিয়েছেন। ইসলামপুর প্রায় পনের মাইল। ঝোঁকের মাথায় চলে গেলেন। অতটা পথ যেতে ভীষণ কষ্ট হবে। রাণুর খুব খারাপ লাগছে। উদ্বেগের কথাটা মাকে জানালে জোহরা বলেছেন, মেয়ে হয়েও বাপকে চেনো না! বরাবর ওইরকম না? 'উঠল বায় তো মক্কা যাই।' তার ওপর ইদানিং দেখছি, তেজটা হঠাৎ বেড়ে গেছে। খুব ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছেন।

রাণু বলেছে, তোমার জামাইয়ের ডলারের ম্যাজিক!

অমনি জোহরা আগুন। শাহাবুদ্দিনের ব্যাপারে এতটুকু খোঁচা বরদাস্ত করতে পারেন না। দলিজঘরে বাইরের লোক আছে বলে চেঁচামেচিটা ততকিছু হয়নি।

রাণু হাসি চেপে নিজের ঘরে এসে ঢুকেছে। সাতটা বাজতে বাজতে পাঁচজন ছাত্রী এসে যাবে। দলিজঘরে আজ বসা যাবে না। নাজিমের গেস্ট আছে। নাজিম আজ ওঘরে শুয়েছে। এখনও ওঠার নাম নেই। সকালের দিকে কাজিসায়েব কিছুক্ষণ ডিসপেনসারি সাজিয়ে বসেন। রাণুর টিউশনির জন্যে দলিজঘরের বারান্দাতেই বসতে হয় তাঁকে। একটা তক্তাপোস আর বেঞ্চি পাতা আছে সেখানে। রাণুর ছাত্রীরা না এলে ঘরের ভেতর বসেন। ডিসপেনসারি বলতে একটা ছোট্ট আলমারি আর ওই বাকসো। আলমারিটা টেবিলের মাথায় বসানো আছে। ওটা ওষুধের স্টক।

রাণুকে আজ ভেতরের বারান্দায় বসতে হবে ছাত্রীদের নিয়ে। শতরঞ্জি বা মাদুর যা হয় একটা কিছু পাতবে। টিউশনির ছাত্রী-সংখ্যা দুজন বাড়িয়ে ফেলেছে হঠাৎ। ঝামেলা বেড়ে গেছে। টাকার দরকার যত বেশি থাক, একসঙ্গে বেশি ছাত্রী নিতে চাইত না রাণু। ওভাবে পড়ানোর মানে ফাঁকি দেওয়া তো বটেই, ম্যানেজ করা যায় না। তার ওপর সকাল সাতটা থেকে ন'টা, আবার এগারোটা থেকে পাঁচটা বকবক করা খুব কষ্টকর। সন্ধ্যার দিকে টিউশনির প্রস্তাব সে নিজে কোনোদিন দেয়নি। বুলির ঘাড়ে

ফেলে দিয়েছে। বুলির কাছে পড়ার তত গরজ ছিল না কারুর। ক'দিন পরে দেখা যেত বুলি অপেক্ষা করছে, ছাত্রীরা আর আসছে না। এতে বুলি খুশি যতটা হত, দুঃখও পেত। তার পড়াশোনার খরচ চালাতে রাণুআপা কতকাল আর কষ্ট করবে? তার ওপর সংসারেরও দায় আছে খানিকটা। জমির ধানে তিনটে মাসও চলে না। এদিকে নাজিম নিয়মিত না হলেও মাঝে মাঝে মায়ের হাতে টাকাপয়সা দেয়। কোনো মাসে কম, কোনো মাসে কাজিসায়েবকেও খুশি করার মতো বেশি। রাণু তার রোজগারের প্রায় অর্ধেকটা দেয়, অর্ধেক ব্যাংকে জমায়। আব্বার পরামর্শে।

গত দু-তিনটে বছরে এভাবে সংসারের চেহারায় কিছু মেদ ও লালিত্য ফিরেছিল। তাই বলে খানবাহাদুরের আমলের সেই জমজমাট গেরস্থালি, বনেদীপনা এবং আভিজাত্যের চেহারার সঙ্গে এর কোনো মিল নেই। সে সময়টাও গেছে বদলে। মেয়েদের রোজগারে সংসার চলে জেনেও কেউ মাথা ঘামায় না তা নিয়ে। সমাজ বলতে যা টিঁকে আছে, সেখানেও সে আমলের আঁটোসাঁটো বাঁধন নেই। নৈলে মসজিদে কথা উঠত। বিয়েশাদি বা মৃত্যুতে সমস্যা দেখা দিত। বুলির বিয়েতে কত লোক খেয়ে গেছে। মুসলমান হিন্দু একসঙ্গে বসে খেয়েছে। শহর থেকে ক্যাটারার এসেছিল। নাজিমের উদ্যোগে ভাঙা দেউড়ির মাথায় মাচা বেঁধে রঙীন কাপড়ের নহবতখানা বানিয়ে মাইক বেজেছিল।

রাণু জানলার বাইরে তাকিয়ে কাঠমল্লিকা ফুলের গাছটা দেখছিল। গাছটার নাম বুলি দিয়েছিল 'দাদীবুড়ি। এবারও বড় বড় সবুজ পাতার মধ্যে সাদা ফুল ফুটিয়েছে থরেবিথরে। ভাঙা দেউড়ির ফাটলে কত ফুল আটকে রয়েছে। রাণু মায়ের কাছে শুনেছে, ওই দেউড়িতে একসময় রোজ সন্ধ্যা ছ'টায় নহবত-ঘণ্টা বাজিয়ে যেত শেখপাড়ার একটা লোক।

হঠাৎ রাণু দেখল সাদা পাজামা-পানজাবি পরা এক ভদ্রলোক কোমরে দু'হাত রেখে দেউড়ির দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে আছেন। চোখে

চশমা আছে। বেশ মাজাঘষা চেহারা। নাজিমের গেস্টদের মধ্যে এমন শান্‌দেওয়া ধারালো চেহারা, যাকে ভদ্রলোক বলা যায়, দেখেনি রাণু। এ আবার কাকে জুটিয়ে আনল নাজিম? রাণুর মনে হল, অন্তত কাজিপরিবারের মর্যাদা রাখতে নাজিমের এমন গেস্টকে আরও একটু বেশি খাতির করা উচিত ছিল।

এদিকে ঘুরতেই রাণু সরে এল জানলা থেকে। তারপর নাজিমের গলা শোনা গেল।…উঠে পড়েছেন দেখছি। আমার খুব খারাপ অভ্যাস জানেন? সকাল সকাল উঠতে পারি না। আব্বা বলেন, এজন্যেই নাকি আমার লেখাপড়া হয়নি।

ওর গেস্ট বলল, নতুন জায়গায় ঘুম হয় না। পাঁচটাতে বেরিয়ে অনেকটা চক্কর মেবে এলাম।

কদ্দূর গিয়েছিলেন?

রেললাইন পেরিয়ে নদীর ধারে ধারে অনেকটা। ইটভাটার ওখানে একটা লোকের সঙ্গে গল্প করলাম কতক্ষণ। তারপর হাঁটতে হাঁটতে স্টেশনে গিয়ে চা খেলাম। নাজিমের গেসট হাসতে লাগল। যেখানে যাই, ভীষণ ঘুরি। না ঘুরলে জায়গাটা চেনা যায় না।

কেমন মনে হল কুতুবগঞ্জকে?

শহর-গ্রামের অদ্ভুত মিকসচার।…

গলার স্বরে কথাবার্তায় মানুষের পরিচয় অনেকটা ফুটে বেরোয়। রাণুর মনে হল, নাজিমের এই গেসট রীতিমতো ভদ্রলোক এবং 'মিকসচার' শব্দটার উচ্চারণে তার শিক্ষার ছাপ আছে। রাণুর কৌতূহল বেড়ে গেল। সে উঁকি মেরে দেখল, নাজিমের গেস্ট এপাশে জানলার নিচে তার ফুল বাগানটার ভেতর ঢুকে গেছে। থমকে দাঁড়িয়েছে। নাজিম বলল, আমার বড় বোন এইসব করে-টরে। ফুলের খুব সখ।…রাণু ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় গেল।

কিছুক্ষণ পরে রাণু যখন ছাত্রীদের নিয়ে বসেছে, নাজিম এসে ডাকল, আপা! একমিনিটের জন্যে একবার আসবি?

রাণু বোঝে, নাজিম যখন তাকে খাতিব করে, তখন আপা বলে ডাকে। খাতিরের কাবণ নিশ্চয় থাকে কিছু। বাণু বলল, কি?

একটুখানি আয় না। নজিম তোষামুদে হাসি হাসল। একটু এলে ওদের লেখাপড়া বরবাদ হবে না বাবা?

রাণু উঠল অগত্যা। থামেব আড়ালে দাঁড়িয়ে নাজিম বলল, আর কেউ হলে বলতাম না, খোদার কসম। একটুখানি আয় না দলিজঘবে। রাজামিয়া আলাপ করতে চান।

নাজিম অনুনয় করল। কখনও কি বলেছি তোকে—কত গেস্ট তো এনেছি? ইনি খুব নামকবা লোক। ওকে বলেছি অমার বোন এম এ বি টি পাস। স্কুলের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেডমিসট্রেস। না দেখলে ভাববে ধাপ্পা দিয়েছি। একমিনিট আপা। শুধু দুটো কথা বলেই চলে আসবি।

বাণু কৌতূহল চেপে বলল, না না। মা বকবে। আব্বা শুনলে খুব রেগে যাবেন।

নাজিম চটে গেল। ইস, ভারি পর্দার বিবি বে! কথায় বলে ‘বিবি হাটে যায় মাঠে যায়, লোক দেখলে বিবির বড্ড শরম পায়। হুঁ, মা বকবে। আব্বা রেগে যাবেন! নাজু বলছে কি না!

রাণু হেসে ফেলল।···আহা, তোর মিয়াসায়েব তো চলে যাচ্ছেন না এখনই। এরা চলে যাক, যাব’খন!

জেদী নাজিম বলল, এলে এখন। আমার সাফ কথা।

রাণু পা বাড়িয়ে বলল, চল। যাবার সময় সে রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে মাকে দেখে নিল। জোহরা মোড়ায় বসে খাচ্ছেন আর ময়নার মায়ের সঙ্গে চাপাগলায় কথা বলছেন। জোহরার সারাদিন চা খাওয়া অভ্যাস। উনুনের আঁচ নিভতে দেন না। ছোট্ট এনামেলের হাঁড়িতে চায়ের লিকার করা হয়েছে ভোরবেলায়। গরম করবেন আর দুধ চিনি মিশিয়ে খাবেন।

রাণু ঘরে ঢুকেই মুখ না তুলে আদাব বলল। নাজিম বলল, আমার রাণুআপা রাজাভাই।

রাজামিয়া বলল, দাঁড়িয়ে কেন ? বসুন।

রাজামিয়া বলল, আপনাদের ফ্যামিলির পরিচয় পেয়ে খুব ভাল লাগল। এডুকেশানে আমাদের সোসাইটি এখনও কত ব্যাকওয়ারড ভাবলে কষ্ট হয়। সেক্ষেত্রে আপনাদের মতো মেয়েদের দেখলে আশা জাগে। তবে আরও আশা জাগে, এমন সুন্দর ফুলবাগিচা করতে দেখলে। রিয়্যালি, আপনার হাতের কাজ দেখে মুগ্ধ হয়েছি।

নাজিম বলল, এবার নিজের পরিচয়টা দিন রাজাভাই। রাণুআপা ভাবে, এ নাজু ট্রাকড্রাইভারি করে। সঙ্গে খালি আজে-বাজে লোকের ভাব। বলুন আপনি কে ?

রাজামিয়া বলল, দেখুন নাজুমিয়া, নিজেকে এত ছোট ভাববেন না। এ দেশে ডিগনিটি অফ লেবার বলতে কিছু নেই। আমি দুনিয়ার বহুদেশে ঘুরেছি। ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান···

রাণু আস্তে বলল, আপনি কোথায় থাকেন ?

রাজামিয়া একটু হাসল।···আপনি তো টিচার। সেই কবিতাটা নিশ্চয় পড়েছেন। সবখানে মোর ঘর আছে···না কী যেন ? আই অ্যাম এ সিটিজেন অফ দা ওয়ারল্ড। স্থায়ী ঠিকানা বলতে কিছু নেই। কাজেই আপনার প্রশ্নের জবাব দেওয়া কঠিন আমার পক্ষে। তবে হ্যাঁ, জন্মেছিলাম একটা জায়গায়। আশা করি, বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটের নাম শুনেছেন। ঐতিহাসিক এবং খানদানী গ্রাম। এখন অবিশ্যি সেখানকার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। আই অ্যাম কোয়াইট অ্যালোন ইন দা ওয়ারল্ড। নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিখেছি। স্ট্রাগল করেছি সারাজীবন। এখনও করছি না বলব না। আরটিস্টদের লাইফই এমন।

রাণু ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, কী করেন আপনি ?

খুব সঙ্গত প্রশ্ন। রাজামিয়া কাঁধ নাড়া দিয়ে একটি ভঙ্গি করল। 'ওয়ান ম্যানস শো' বলে একটা কথা আছে জানেন তো ? নিন্দাত্মক অর্থে। কিন্তু আমার এটাই প্রফেশান। ধরুন, মাইস, মিমিক্রি,

তার সঙ্গে একটু ফষ্টিনষ্টি—আই মিন, একক অভিনয়—এইসব মিকসচার। জাস্ট এ হচপচ আর কী!

নাজিম বলল, ধুলিয়ানে স্কুলের মাঠে স্টেজ বেঁধেছে। লোক থই-থই করছে। আমি ভাবলাম থিয়েটার হচ্ছে। গিয়ে দেখি, উরেব্বাস! শো ভাঙল। আলাপ-পরিচয় করে এলাম। দুপুর বেলা গাড়ি নিয়ে আসছি, দেখি রাস্তার ধারে ভাইজান দাঁড়িয়ে আছেন। পিঠে ওই বোঁচকাটা, আর হাতে এই স্যুটকেশ।

নাজিম জিনিস দুটো দেখিয়ে দিল। রাণু বুঝতে পেরে বলল, এখানে শো করবেন নাকি?

নাজিমকে দেখিয়ে রাজামিয়া বলল। ব্রাদার তো সেই ধোঁকা দিয়ে নিয়ে এল।

নাজিম হইচই করে বলল, ধোঁকা না সত্যি, ওবেলা দেখে নেবেন রাজাভাই। এ নাজুকে বাজে লোক ভাববেন না।

রাণু বলল, আচ্ছা। আসি এখন।···

কুতুবগঞ্জ চিরদিন হুজুগে এবং আমোদপ্রিয় জায়গা। এলাকার মোটামুটি বড় একটা বাণিজ্যকেন্দ্র বলে পয়সাওলা লোক আছে প্রচুর। প্রায়ই কলকাতার যাত্রা-থিয়েটার, কখনও খ্যাতিমান গায়ক-গায়িকাদের গানের অনুষ্ঠান লেগে আছে। টিকিট কেটেই এসব অনুষ্ঠান হয়। এলাকার গ্রাম থেকেও লোকেরা এসে ভিড় করে। পুরো শহর হয়ে যেতে আর দুটো জিনিস দরকার শুধু। সিনেমা হল আর একটা কলেজ। দুটোরই চেষ্টা চলছে অনেকদিন থেকে। কলেজের জন্য ফাণ্ড খোলা হয়েছে। সেই ফাণ্ডে টাকা যোগাতে কলকাতার সহস্র রজনী পেরুনো নাটক এসেছিল শীতের সময়। বসন্তে দু'রাত্রি যাত্রাও হয়ে গেছে। রাজামিয়ার 'ওয়ান ম্যানস শো' বাজারের চৌমাথায় প্রথম রাতেই জমিয়ে দিল।

এমন ব্যাপার-স্যাপার খুব কম লোকেই দেখেছে। নতুনত্বের চমকতো ছিলই, রাজামিয়ার তাক লাগানো ক্ষমতাও সামান্য ছিল না।

দু'ঘণ্টা ধরে একটা মাত্র লোক সবাইকে থ বনিয়ে দিয়েছে। মূকাভিনয় দিয়ে শুরু। তারপর ঝটপট পেনট ধুয়ে পোশাক বদলে একক অভিনয়ে সিরাজুদ্দৌলার শেষ জীবনের বিয়োগান্ত ঘটনা। মুরশিদাবাদ জেলার মানুষেব সেনটিমেনটে রাজামিয়া ঝোপ বুঝে কোপ মারার তালে আঙুল বোলাতেই লোকের চোখে বান ডেকে গেল। ওই সেই মুরশিদাবাদ—এই গঙ্গার তীরে ওই সেই হীরাঝিল··· বলতেই দড়বড় করে হাততালি। লোকটা জাদুকর বলতে হয়। সেনাপতি বীর মোহনলাল আসলে মারওয়াড় থেকে আসা জৈন ব্যবসায়ীদের এক বংশধর নামেই সে পরিচয় রয়েছে, শোনামাত্র পাটোয়ারিজী কান খাড়া কবেছিলেন। এ কুতুবগঞ্জে জৈন মারোয়াড়িদের বংশধররাও একইভাবে বাঙালী হননি কি? পাটোয়ারিজী হাততালি দিলেন। জমে গেল আসর। ততক্ষণে পাটোয়ারিজী ঠিক করে ফেলেছেন, কাল রাজামিয়ার শো দেবেন।

রাজামিয়া গজল গাইতেও ওস্তাদ। হারমোনিয়াম তবলা যোগাড় করা হয়েছিল। গজলের পর শোয়ের 'টকমিষ্টি আচার'। প্রথমে শুরু হল প্রখ্যাত সিনেমা অভিনেতাদের অভিনয়ের নকল। তারপর স্রেফ হরবোলার আসর। জন্তুজানোয়ার পাখ-পাখালির ডাক দিয়ে শেষ করে রাজামিয়া করজোড় দাঁড়িয়ে মাথাটা নোয়াল।

নাজিম আহ্লাদে হেসে ওকে জিগ্যেস করেছিল, আমার গেস্টকে কেমন দেখলি? রাণু বলেছিল, বেশি ইংরিজি বলে। নাজিম বুঝতে পেরেছিল, রাণুর এটা ব্যঙ্গ। তাই চটে গিয়ে বলেছিল, বলবে না? তোর মতো পাঁচটা এম এ পাশ ওর লেজে ঝোলে।

পরে নাজিম তোষামোদ করেছিল রাণুকে।···শো দেখতে যাস যেন। নৈলে আমার প্রেসটিজ থাকবে না। ওনাকে বলেছি তুই যাবি।

রাণুর কৌতূহল ছিল। শেষপর্যন্ত যেত গুণমালাকে ডেকে নিয়ে। কিন্তু হল না। আব্বা এসে গেলে বাধা পড়ল।

ইসলামপুর থেকে মবিনকাজি সন্ধ্যায় ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু

অবস্থা কাহিল। তাও তো দিনটা মোটামুটি মেঘলা ছিল। নইলে রাতটা থেকে যেতেন ওখানে। ওরা খুব সেধেছিল। কিন্তু থাকেননি।

ছেলে খুব ভাল, খুবই ভাল। দেখে কে বলবে চাষীঘরের ছেলে? মিয়ামোখাদিমের মত চেহারা। মাথায় একটু টাক পড়েছে, তাতে কি? গায়ের রঙ, স্বাস্থ্য অতি চমৎকার। কথাবার্তা অতিশয় ভদ্র। শুধু…

জোহরা বলেছিলেন, কী?

শুধু একটা ব্যাপার বড় খারাপ লাগল। খাওয়াদাওয়ার রীতি আর পরিবেশ কেমনধারা যেন। পাকা বাড়ি করেছে। কিন্তু বাইরের দেয়ালে লাঙল-কোদাল ঝুলছে। বাড়ির মেয়েদের দেখলাম বাইরের দেয়ালে গোবরচাপড়ি দিচ্ছে, ঠ্যাঙের ওপর কাপড়। চাষীবাড়ি যা হয়। তবে ছেলেটা গোবরে পদ্মফুল। ছেলে আমার পছন্দ হয়েছে।

বিয়ে করে ছেলে আলাদা থাকবে। জোহরা বলেছিলেন।

থাকবে কি? বড় ভাইদের খুব অনুগত মনে হল। তাছাড়া যা ভেবেছিলাম, তাই। রাণুকে চাকরি ছেড়ে দিতে হবে। সে কথা বেশ নম্র জবানেই বলল অবশ্য। বলল, শুধু এটুকুই দাবি। টাকা-পয়সা জিনিসপত্র কিচ্ছু চাইনে।

রাণু বলেছিল, ছাড়ছি চাকরি। বলেই সে উঠে গিয়েছিল নিজের ঘরে। কিন্তু কান করে কথা শুনছিল।

জোহরা বলেছিলেন, খোঁজখবর নেওয়া উচিত ছিল, এতদিন বিয়েশাদি হয়নি কেন!

কাজিসায়েব বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, সে তো জানা। উচ্চশিক্ষিত মেয়ে পায়নি বলেই হয়নি। কলকাতার মেয়ে তো গাঁয়ে আসবে না। মেয়ের বাবা নেহাত দায়ে ঠেকলে অন্য কথা। অবিশ্যি ইসলামপুর এখন আর নেহাত গাঁ নয়। কুতুবগঞ্জের মত শহর হয়ে উঠেছে। ইস্টবেঙ্গলের হিন্দুরা এসে এত উন্নতি। কুতুবগঞ্জে ওনাদের জায়গা দেওয়া হয়নি। নৈলে দেখতে, এখানেও কবে কলেজ হয়ে যেত।

এসব কথাবার্তা অনেকটা রাত অব্দি হয়েছিল। রাণু বুঝতে পেরেছিল, আব্বা মনস্থির করতে পারছেন না। বারবার শুধু খাওয়াদাওয়ার রীতি আর বাড়ির পরিবেশের কথাটা তুলছেন। তারপর বলছেন, খুব বিনীত ভদ্র ছেলে তো! বড় ভাইদের কথার ওপর কথা বলতে পারবে না মনে হল। ও তো বলছে, দাবিদাওয়া নেই—নিজের পছন্দে বিয়ে করছি। কিন্তু বড় ভাইদের মুখ দেখে মনে হল, পাকা কথার সময় দাবিদাওয়া তুলবেই তারা।

রাণু ঠোঁট কামড়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর নিঃশব্দে কপাট এঁটে শুয়ে পড়েছিল।···

পরদিন গুণমালাদের বাড়িতে গিয়ে রাণু শুনল রাজামিয়ার শোয়েব গল্প। ওরা বাড়িশুদ্ধ গিয়েছিল দলবেঁধে। গুণমালার মা পদ্মাবতী নকল করেও দেখালেন। ওর বউদি শোভারাণী ঘোমটার আড়ালে খুব হাসল শাশুড়ির কাণ্ড দেখে। শোভারাণী নিমতিতার মেয়ে। ওর বাবা গুলাবদাস জৈনের বিড়ি-তামাকের পাতার কারবার। জেলা জুড়ে সে কারবারের প্রসার আছে। চালচলনে গুণমালাদের মত এতটা বাঙালী নয় অবশ্য। তবে কথাবার্তায় ধরা যাবে না কিছু।

রাণু যায়নি শুনে গুণমালা অবাক হয়ে বলল, সে কী! কুতুবগঞ্জে কোন ফাংশনে রাণু নেই ভাবতেই কেমন লাগে যেন। তুই কি আজকাল বড়দির মত প্রেসটিজওয়ালী হয়ে উঠেছিস?

রাণু বলল, বয়স হয়েছে। এখনও কি খুকিপনা সাজে আমার?

গুণমালা ওর চুল টেনে দিয়ে বলল, তুই শীগগির বুড়িয়ে যাবি বলে দিলাম। আমায় দেখে শেখ। তোর দিব্যি, কাল মেয়েদের ভিড়ে তোকে ভীষণ খুঁজেছিলাম। ধরেই নিয়েছিলাম তুই আসবি।

পদ্মাবতী প্লেট সাজিয়ে ফল আনলেন রেকাবিতে। কতদিন পরে এলে রাণু। খাও।

পাটোয়ারিজীর পরিবারে রাণুর আনাগোনা ও মেলামেশা খুব ছোটবেলা থেকে। ওকে মুসলমান বলে যেন ভাবতেই পারেন না

পদ্মাবতী। বাছবিচার বা অস্পৃশ্যতার বোধ যে নেই, এমন নয়। তবে কুতুবগঞ্জে নতুন সময়ের হাওয়া দিনে দিনে অনেক পুরনো রীতিনীতিকে ঝেঁটিয়ে সরিয়ে দিয়েছে। মবিনকাজি গল্প করেন, কবে একবার ঝুলনপূর্ণিমার মেলায় রাসমন্দিরে যাত্রা হচ্ছিল। সেনাপতির ভূমিকায় মুসলমান পারট করছে জানতে পেরে হই-চই পড়ে যায়। রাসমন্দিরের চত্বরে মুসলমানদের ঢোকা নিষিদ্ধ ছিল। মাঝরাতে আসর বন্ধ করে অধিকারী বেচারাকে দল নিয়ে পালাতে হয়েছিল। এখন রাসমন্দিরের দালানবাড়িতে ঢোকার কড়াকড়িটা কমে গেছে। হিন্দু-মুসলমান চেনাও একটা সমস্যা বটে। কিন্তু চিনতে পারলে কেউ হই-হই করে তেড়ে আসে না। একবার লক্ষ্মণদাস কীর্তনীয়াকে এক আসরে বায়না করা হয়েছিল। লক্ষ্মণদাস আগেভাগে জানিয়ে দিয়েছিলেন, আমার খোল বাজিয়ে কিন্তু মুসলমান। শেষপর্যন্ত তাতে আপত্তি ওঠেনি। তিরিশ বছর আগে হলে আপত্তি উঠত—লক্ষ্মণদাস যত বড় কীর্তনীয়া হোন না কেন। তার চেয়ে বড় কথা, যাত্রা, থিয়েটার, গান-বাজনার আসরের জন্য লোকে আর রাসমন্দিরের প্রত্যাশী নয়। কোন মেলা বা পালা-পার্বণেরও কেউ মুখ চেয়ে নেই এ ব্যাপারে। বাজারের ব্যবসায়ীরা আছেন, কয়েকটা ক্লাব আছে, নব্য ছোকরারা আছে···যখন খুশি চাঁদা তুলে জুড়ে দিলেই হল।

গুণমালা বলল, এই রাণু, জানিস? বাবা আজ গদীর সামনে শো দিচ্ছেন। নাটমন্দিরের ওদিকে ফাঁকা মাঠ আছে না? সেখানে।

রাণু বলল, জেঠু বুঝি কলেজ ফাণ্ড তোলার মতলব করেছেন?

গুণমালা বলল, না না। টিকিট কেটে নয়। স্রেফ সখ। তুই যদি আসিস, আমি কিন্তু যাব।

একটু পরে রাণু গুণমালাকে সঙ্গে নিয়ে বেরুল।

রেল লাইনের ধারে ধারে এগিয়ে গঙ্গার ধারে পৌছে রাণু বলল, চল্, বুড়িমাতলায় অনেককাল পরে একটু বসি।

আজও আকাশ মেঘলা হয়ে আছে। সারা আকাশ জুড়ে বালির চড়ায় স্রোতের রেখার মত অজস্র রেখা আর ভাঁজ পড়েছে দুধসাদা

মেঘের গায়ে। গুণমালা দূরের দিকে তাকিয়ে বলল, কলকাতায় আমার একটুও ভাল লাগে না। জানিস রাণু? আমার শ্বশুরবাড়িটা এমন ঘিঞ্জি গলির মধ্যে, কী বিশ্রী! নিচে দিনরাত্তির ভিড়, ঠেলা-গাড়ি, তার মধ্যে ট্রাক, টেম্পো। জঘন্য। আমাদেব বাড়িটায় যত লোকজন, তত মালপত্র বোঝাই। গোডাউন একেবারে। আমার দম আটকে আসে।

তোর কর্তাকে তো তত বিজনেসম্যান মনে হয়নি। রাণু বলল।

বিজনেসম্যানের ফ্যামিলি। কী বলছিস! ওরা ব্যবসা ছাড়া কিছু বোঝে না। গুণমালা নরম গলায় বলল। কমপ্লিটলি অন্য-রকম। আমাদের সঙ্গে মেলে না। আমার মুখ ফসকে বাংলা বেরিয়ে গেলে ননদরা ভেংচি কাটে। আমাকে ডাকে কী বলে জানিস? 'বাঙালীন।'

রাণু হেসে ফেলল।···তুই তাহলে খাঁচায় ঢুকে আছিস দেখছি!

গুণমলাও হাসল।···এসব থাক। অন্য কথা হোক। রাণু, আগে গঙ্গার জলটা কত কালো আর পরিষ্কার ছিল, না রে? ওই মাঝ অব্দি চড়া পড়ত তখন। তোর মনে পড়ছে? একবার ওপারে গিয়ে তুই, আমি, মানু কে কে ছিল যেন—তবমুজ চুবি করেছিলুম?

রাণু বলল, তারপর তাড়া খেয়ে বালিতে দৌড়ুনো যায় না। উঃ! সে কী অবস্থা।

গুণমালা খিলখিল করে হেসে উঠল···মানুটা ছিল গাব্দা। 'ঢপি' বলতাম ওকে! ঢপি পেছনে পড়ে গেছে, কেউ লক্ষ্য করিনি। তারপর তো···

রাণু ঘুরে কিছু দেখতে দেখতে বলল, গুণমালা! উঠতে হল এখান থেকে।

কেন বল্ তো?

আগে কিন্তু এত বেশি লোক ছিল না। কত নির্জন জায়গা ছিল বল। এখন সবখানে লোক।···বলে রাণু উঠে দাঁড়াল।

গুণমালা বলল, এখানে বসবে তার মানে কী। বস্ না। আমরা আছি দেখলে অন্য কোথাও গিয়ে বসবে।

রাণু বাঁকা মুখে বলল. আর সেদিন নেই কুতুবগঞ্জে। সুযোগ পেলে এখন মেয়েদের ঘাড়েই বসবে। আয়, বরং বড়দির কাছে আড্ডা দিই গে।

গুণমালা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, কই ? কারা আসছে ?

রাণু বলল, লাইন থেকে নামছে। দেখতে পাচ্ছিস নে ?

গুণমালা দেখতে পেয়ে বলল, রাণু! সেই ভদ্রলোক। কাল রাত্তিরে যার শো হল !

রাণু চিনতে পেরেও বলল, তাই বুঝি ?

রাণুকে পা বাড়াতে দেখে গুণমালা বলল, তোর স্মার্টনেস অনেক কমে গেছে রাণু। কেউ আসবে বলে লেজ তুলে পালাতে হবে ? বসে থাকতে কত ভাল লাগছিল !

রাণু বলল, চল্, তাহলে আমাদের স্কুলের ঘাটে গিয়ে বসি গে ! ওখানে কেউ যাবে না।

দুজনে কয়েক পা এগিয়েছে, রাজামিয়া ডাকল। আরে শুনুন, শুনুন বেগমসায়েবা ! বান্দা আপনাকে দেখতে পেয়েই খেদমতে (সেবার্থ) হাজির হল, আর আপনি চলে যাচ্ছেন ?

রাণু ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। কথার ভঙ্গিতে রাতের শো মনে পড়ায় গুণমালা হাসি চাপল। তারপরই অবাক হয়ে রাণুর দিকে তাকাল। রাণু হাসবার চেষ্টা করে বলল, বেড়াতে বেরিয়েছেন ?

জী হাঁ। রাজামিয়া হাত চিতিয়ে একটা ভঙ্গি করল। রেল লাইন ধরে আসতে আসতে হঠাৎ দেখি, আপনি আর উনি বসে আছেন। আমার আইসাইট খুব শার্প, দেখলেন তো ? আপনাকে চিনতে পেরেছিলাম।

রাণু কী বলবে ভেবে পেল না। গুণমালা নমস্কার করে বলল, কাল রাত্তিরে আপনার শো দারুণ ভাল লেগেছিল। আজ তো আপনি বাবার গদীর সামনে শো দেবেন ?

রাজামিয়া করজোড়ে পাল্টা নমস্কার করে বলল, আপনার বাবা, মিন, মিঃ মোহন সিং পাটোয়ারি?

মাথা নেড়ে গুণমালা হাসল।...আজ নিশ্চয় নতুন প্রোগ্রাম করবেন?

ও সিওর, সিওর। রাজামিয়া রাণুর দিকে তাকিয়ে বলল, রাণু বেগম কি বাই এনি চান্স আমার ওপর অসন্তুষ্ট?

রাণু বলল, না, না। অসন্তুষ্ট হব কেন? ও কী বলছেন!

রাজামিয়া গুণমালাকে বলল, আই থিংক, আপনাদের নির্জন আলাপে বাধা দিলাম। সরি, ভেরি সরি মিসেস—

সে গুণমালার সিঁথির দিকে তাকিয়ে ছিল। গুণমালাদের বাড়িতে সিঁদুর পরার রীতি আছে বাঙালীদের মত। শ্বশুরবাড়িতে বিশেষ নেই।

আমার নাম গুণমালা। গুণমালা ঝটপট বলে দিল।

মিসেস গুণমালা, বেয়াদপির জন্য বান্দার গোস্তাকি মাপ করবেন। ...বলে রাজামিয়া প্যান্টের পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাল। যদি আপত্তি না থাকে, আপনাদের কিঞ্চিৎ এন্টারটেন করতে পারি। আসুন না, বসুন!

বলেই গোঁফের নিচে রহস্যময় হাসল রাজামিয়া।...দিনদুপুরে যদি ভূতের সঙ্গে আমার আলাপ শুনতে চান, শোনাতে পারি।...ওই যে শিমূল গাছটা দেখছেন, ওর ডগায় আমি কিন্তু ভূতটাকে দেখতে পাচ্ছি। জাস্ট এ শ্যাম্পল। আমি ওকে ডাকছি। শুনুন!...হ্যাল্লো মিস্টার! গুড মর্নিং!

ঠিক শিমূল গাছটার ডগা থেকে আওয়াজ এল, গুড মর্নিং!

রাজামিয়া হাসতে হাসতে বলল, বিশ্বাস হল তো?

রাণু ও গুণমালা একসঙ্গে বলে উঠল, ভেনট্রিলিকুইজম!

তাহলে জানেন দেখছি। রাজামিয়া হতাশ মুখভঙ্গি করল।

নাঃ, আজকাল মানুষ কত ক্লেভার এ্যানড ইনটেলিজেন্ট হয়ে উঠেছে। দে নো লট অফ থিংস। হার মানলাম তাহলে।

গুণমালা বলল, না, না। দারুণ ভাল লাগবে আমাদের। ভূতটার সঙ্গে একটু কথা বলুন না প্লিজ!

তাহলে আপনারাও প্লিজ দর্শক সেজে ওখানে বসুন। কেমন? রাজামিয়া সিগারেটের রিঙ বানিয়ে গঙ্গার আকাশে ভাসিয়ে দিল।

গুণমালা রাণুকে টেনে নিয়ে গেল বুড়িমাতলায়। দুজনে বসল। তারপর গুণমালা বলল, রাণুকে আপনি চেনেন। অথচ রাণু আমাকে এখনও ব্যাপারটা একসপ্লেন করছে না।

রাণু অপ্রস্তুত হেসে বলল, চেনেন মানে, নাজুর সঙ্গে উনি এসেছেন। আমাদের বাইরের ঘরে আছেন।

গুণমালা ওকে খুঁচিয়ে দিয়ে বলল, আমাকে বলিসনি তো?

রাজামিয়া বলল, বলার মতো কোনো বিরাট ঘটনা নয় বলেই বলেননি। ওই তো শুনলেন বাইরের ঘরে আছি। আমি একজন বাউণ্ডুলে চালচুলোহীন মানুষ। পেটের ধান্দায় দেশে দেশে ঘুরি!

রাণু আস্তে বলল, আমি কিন্তু কথাটা সেভাবে বলিনি।...

পাঁচ

নাজিমকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ট্রাক নিয়ে যেতে হয়েছে কোথায়। তাই মাকে বলে গিয়েছিল, তার গেস্টের খাতিরযত্ন যেন ঠিক মতো হয়। ময়নার মাকেও বলে গিয়েছিল সে। রাতে মুর্গি হয়েছিল মধুমিয়ার হোটেলে। সকালে যশোদা রেস্তোরাঁয় ব্রেকফাস্ট খাইয়ে সে গেছে। দুপুরে বাড়িতে খাবে রাজামিয়া। বিশাল একটা মাছ কিনে দিয়ে গেছে নাজিম। কাজিসায়েব মাছটা দেখেই খুশি। বাড়িতে মেহমান (অতিথি) এলে বনেদী প্রথাটা তিনি যত্ন করে মানেন। শুধু নাজিমের মেহমান এলে আড়াল থেকে যা করার, করেন। কিন্তু সকালে

পাটোয়ারিজীর কাছে রাজামিয়ার গুণাবলী শুনে কৌতূহলী হয়ে উঠেছেন। বাড়ি ফিরে দেখেন, মেহমান কোথায় বেরিয়েছে।

মেহমান ফিরল রাণুর সঙ্গে। কৈফিয়তের ভঙ্গিতে রাণু বলল, নাজুর গেস্টের সঙ্গে গেটের কাছে দেখা হল। আমি আসছি বড়দির ওখান থেকে, উনিও ঢুকছেন। ফের রাণু মিথ্যা বলল জেনেশুনে।

কাজিসায়েব বললেন, যাই। ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করি গে। পাটোয়ারিজীর কাছে শুনলাম, খুব জবর আর্টিস্ট। এমন লোক কীভাবে নাজুর পাল্লায় পড়ল? কাজিসায়েব খিকখিক করে হাসলেন।

রাণু বলল, রান্নার কতদূর মা?

জোহরা বললেন, কেন রে? হয়ে গেছে প্রায়। ও ময়নার মা, জিগ্যেস করে এসো গে, মেহমান গোসল (স্নান) করবে নাকি। গঙ্গার ঘাটের রাস্তাটাও দেখিয়ে দিও।

রাণু বলল, অতদূর কেন? ইঁদারার গোসলখানায় করবে। গঙ্গার ঘাট দেখালে কী ভাববে? ছিঃ! বাড়ির ইজ্জত আছে না? তাছাড়া নাজু ফিরে এসে বকাবকি করবে না?

জোহরা অবাক। চটতে গিয়ে চটতে পারলেন না। নাজিমের কথাটা শুনেই।

রাণু বলল, ময়নার মা! তুমি চৌবাচ্চায় পানি ভর্তি করো। আমি যা করার করছি।...

পীরতলা গাঁয়ের এখানে গঙ্গার চেহারা একেবারে অন্যরকম লাগে নাজিমের। কেমন একটা জংলী-জংলী ভাব। এতসব সবুজ চোখে মেখে যায় আঠার মতো। লোক নেই, জন নেই। খালি গাছ আর ঝোপঝাড়। মাঝে মাঝে দু-এক টুকরো ক্ষেত। গুঁড়ো দুধের মতো মাটি। এই নিঃঝুম জায়গায় কাশেম জুয়াড়ী কেন বাড়ি করল, নাজিম তার মাথামুণ্ডু খুঁজে পায় না। শহরে গিয়ে করতে পারত। কুতুবগঞ্জেও করতে পারত—সেও এক টাউন জায়গা। কাশেম

বলেছিল, চিরটাকাল ভিড়-ভাট্টা নিয়েই তো কাটালাম বাপ। মাঝে মাঝে নিবিবিলিতে গিয়ে জিরিয়ে না নিলে চলে? কথাটা বিশ্বাস হয়নি নাজিমের। ভেবেছিল, নিজের মেয়েটাকে জুয়ার দানে ধরার মতলব করেছে জুয়াড়ী! কিন্তু তেমন কিছু কানে আসেনি এ অব্দি। অবিশ্যি, মুন্নী নিজে ডুবে ডুবে ছেনালী করলে আলাদা কথা।

বাঁশবনটা পেবিয়েই নাজিম হাঁক দিল, কাশেম চাচা! ও কাশেম চাচা!

মুন্নী বেরিয়ে এল। জংলাছাপা শাড়ি পরনে, কোমরে আঁচল জড়ানো। টকটকে লাল হাত কাটা ব্লাউজ গায়ে। কপালে লাল টিপ। গলায় পাউডারের ছোপ। খুব সেজেগুজে আছে আজ। বাঁ হাতে একগুচ্ছের রঙীন চুড়ি, ডানহাতেব কব্জিতে গাব্দা একটা ঘড়ি পর্যন্ত। নাজিম ভুরু কুঁচকে পা থেকে মাথা অব্দি দেখতে দেখতে গাবতলায় এসে দাঁড়াল।···তোমার গুণের বাপজানটি কোথায়? ঘুমোলে, ওঠাও এক্ষুণি। জব্বর কথা আছে।

মুন্নী হাসল শুধু।

যা বাবা! হাসিব কী হল? নেই কাশেমচাচা?

মুন্নী মাথা নাড়ল অভ্যাস মতো।

নাজিম চটে ওঠার ভঙ্গি কবে বলল, সেই মাথানাড়ানো! তারপর সে হনহন এগিয়ে গিয়ে উঠোনে পৌছল। উঠোন ঘিরে পাঁচিলের বালাই নেই। চারদিকে ঝোপঝাড় গাছপালা নিয়ে খোলামেলায় দু'কামরা বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে বাংলো বাড়ির মতো। গা ঘেঁষে টালিচাপানো ছোট্ট একটা রান্নাঘর অবশ্য আছে। তার মধ্যে আবার হাঁস-মুর্গির দরমা। একটা ছাগলও সেখানে থাকে।

বারান্দায় একটা দড়ির খাটিয়া রয়েছে। তার ওপর একটা সাদা বেড়াল বসে থাবা চাটছে। একটা ঘরের দরজা খোলা, অন্যটা বন্ধ। নাজিম ডাকল, ওস্তাদ আছ নাকি? ও ওস্তাদ!

কোনো সাড়া এল না। মুন্নী পেছন পেছন এসে টিউওয়েলেব হাতল টিপে বালতিটা ভরছিল। পুরোটা ভরে রান্নাঘরের ভেতর

রেখে এল। নাজিম সিগারেট ধরাচ্ছিল উঠোনে দাঁড়িয়ে। ধরানো হলে একটু হেসে বলল, নেই তো মুখে বলে দিলেই হত। গাড়ি রেখে এসেছি দবগাতলায়।

মুন্নী মুখ খুলল।···সেদিন এলে না যে বড়? বাবু থাকলে তোমাকে এতক্ষণ মাটিতে ফেলে গলায় ছুরি চালাত। না আসবে যদি, অমন করে কথা দিয়ে যাও কেন?

নাজিম হাসল।···অমন কথা অনেকবার দিয়েছি। গেল কোথায় ওস্তাদ? আবার খেলতে নাকি?

মুন্নী আস্তে বলল, মুনিম মোল্লার বাড়িতে মজলিস বসেছে। সেখানে আছে।

কিসের মজলিস? নাজিম অবাক হল।···ওস্তাদ আজকাল মজলিসে ঢুকে পড়েছে নাকি?

মুন্নী মুখ নামিয়ে বলল, না। আমার ছাড় নিতে গেছে। মোল্লা ডেকেছিল বাবুকে।

নাজিম আরও অবাক হয়ে গেল।···বলো কী মুন্নী! তা এমনি এমনি ছাড় হচ্ছে, নাকি কাশেমচাচাকে টাকা দিতে হচ্ছে জামাইকে?

টাকার কথা শুনিনি। মুন্নী শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল।···শুনলাম, কাল কোথেকে এসেছে লোকটা। আগে তো মোল্লার বাড়িতেই থাকত। মোল্লার অমতে বিয়ে করেছিল বলে মোল্লা খুব চটে গিয়েছিল। এখন মনে হচ্ছে, মোল্লাই বলেছে তালাক দিতে।

তোমাকে যেতে হবে না?

মুন্নী হেসে ফেলল।···মোছলমানের ছেলে হয়েও সেটা জানো না?

নাজিম জোরে মাথা দোলাল। আমি ওসব ধার ধারি না!

মুন্নী বলল, ছাড়ের সময় মেয়েদের থাকার দরকার কী? পুরুষমানুষ তালাক বললেই তালাক।

নাজিম মুন্নীর চোখে চোখ রেখে বলল, তাহলে তো তোমার ছুটি! ঝামেলা থেকে বাঁচলে!

হুঁউ।

নাজিম বলল, চলি। ওস্তাদকে বলো, এসেছিলাম। আবার যেদিন এদিকে আসব, দেখা করে যাব।

মুন্নী বলল, আর একটু বসে গেলে পারো নাজুভাই! বাবুর আসার সময় হয়ে এল।

গাড়িতে মাল আছে।…বলে নাজিম পা বাড়াল। কয়েক পা এগিয়ে সে হঠাৎ ঘুরল।…কুতুবগঞ্জে এক দারুণ শো হচ্ছে, মুন্নী। ওস্তাদকে খবর দিতে এসেছিলাম। রাজামিয়া নামে এক ভদ্রলোক…

মুন্নী কথা কেড়ে বলল, রাজা হরবোলা তো?

নাজিম বলল, রাজা হরবোলা মানে?

বর্ডারের মেলায় মেলায় ঘুরত। মুন্নী বলল। মুখে রঙ মেখে বোবা সাজত। গানও গাইত। আবার হরবোলার ডাকও শোনাত। সেই রাজা হরবোলা তাহলে! হুঁ, 'টেজে' নিজের নাম রাজামিয়াই বলত বটে।

নাজিম সন্দিগ্ধ হয়ে বলল, কেমন চেহারা বলো তো?

কতকটা তোমার মতো দেখতে। গায়ের রঙ তোমার চেয়ে ময়লা একটুখানি। চুলের কেতা অমিতাভ বচ্চনের মতো।…মুন্নী হাসতে লাগল।…বাবুর সঙ্গে খুব আলাপ হয়েছিল। রাজা হরবোলাকে জিগ্যেস করো।

নাজিম বলল, মিলছে বটে। আবার মিলছেও না!

কেন? মিলছে না কেন? মুন্নী জোর গলায় বলল।…কথায় কথায় ইংরিজি বুলি বলে না?

বলে বটে।

সায়েব সেজে থাকে না?

হুঁ, থাকে।

মুন্নী বলল, সেবার কালীতলা বর্ডারের মেলায় পুলিশ ধরেছিল রাজা হরবোলাকে। পাকিস্তানের লোক বলে খুব হেনস্তা করেছিল।

টাকা-কড়ি নিয়ে ছেড়ে দেয়। বাবু বলছিল, ওর বাড়ি নাকি সালার। খুব বড়ঘরের ছেলে।

নাজিম রসিকতা করল।···ওস্তাদ তোমাকে রাজামিয়ার গলায় ঝোলালে ভাল হত। ঝুলবে নাকি? আমি ঘটকালি করতে রাজি আছি।

মুন্নী বাঁকামুখে বলল, আগে নিজে একটা গলায় ঝোলাও। তারপব পরের কথা ভেবো।

নাজিম বলল, ঝোলাব। তেমন মেয়ে কই? দাও না একটা খুঁজে।

মুন্নী মুখ টিপে হাসল।···তোমার যে আবার মিয়ার বেটি নৈলে চলবে না।

চলতে পারে। যদি···

যদি?

তোমার মতো মেয়ে হয় বলেই নাজিম পা বাড়াল। কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে ঘুরে কে একবার দেখল, মুখের ভাব কী রকম হয়েছে।

মুন্নীর মুখটা যেন জ্বলছে। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে রোদেব ঝালর পড়েছে মুখে। বাঘিনীর ছবি যেন। নাকের ফুটো একটু ফুলে উঠেছে। হিসহিস করে বলল, আমার মতো মেয়ে? তোমার সাহস আছে? আমার মতো মেয়ে পেতে হলে বুকের পাটা থাকা চাই।

নাজিম হাসল।···লোকে তো আমাকে ডানপিটে বলে। কেউ বলে গুণ্ডা!

তা বলে। আমার জানা আছে, তুমি কী। সাহস অন্য জিনিস।

জুয়াড়ীর মেয়েটার গায়ে হঠাৎ একটা হাওয়া গঙ্গার দিক থেকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কোমরে জড়ানো আঁচলটা খুলে উড়ছে পেছনে। শরীব ঘুবিয়ে সামলে নিল আঁচলটা। আর সেই হাওয়াটা শনশন করে বাঁশবনের দিকে চলে গেল। তারপর শুকনো বাঁশপাতার

শব্দ, বাঁশবনে কান্নাকাটির মতো অদ্ভুত সব শব্দ। কিছুক্ষণ হুলুস্থুল প্রকৃতি জুড়ে।

নাজিম আস্তে বলল, মুন্নী! আঁতে জোর ঘা দিয়েছ। কিন্তু তোমার কথার উপযুক্ত জবাব দেবার সময় হাতে নেই। গাড়িতে মাল ভর্তি। জগাই হয়তো এক্ষুণি এসে হাজির হবে।

মুন্নী বলল, তোমার সময় কোনোদিনই হবে না। যাও, খুব দেরি করিয়ে দিলাম।

নাজিম হনহন করে বাঁশবনের সরু পথে হাঁটতে থাকল। শরীরটা ভারি ঠেকছে তার। বাঁশবন পেরিয়ে রাস্তায় উঠে সে থামল। ফের সিগারেট ধরাল। অভ্যাস মতো বলল, ধুস্ শালা!

বিকেলে মেঘ কেটে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। গরমটা তেমনি বেড়েছে, যদিও হু হু করে হাওয়া বইছে জোরে। রিকশোয় বড়দির বাড়ি পৌঁছুতে বেশ সময় লেগে গেল রাণুর। পায়ে হেঁটে এলে অনেক আগেই এসে পড়ত।

জয়ন্তী লনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। রাণুকে দেখে বললেন, ভাবছিলাম, রেখা খবর দিল না কী!

রেখা গিয়েছিল দুপুরে। রাণু বলল। তখনই আসতাম। ভাবলাম, আপনি হয়তো রেস্ট নিচ্ছেন।

দুপুরে আমি শুই নাকি! জয়ন্তী এক-পা এগিয়ে একটু হেসে চাপা গলায় বললেন, তোমায় একটুখানি অপ্রস্তুত করে ফেলব হয়তো। জানি না, তুমি কী ভাবে নেবে ব্যাপারটা। অথচ সবদিক ভেবে মনে হল, তোমাকে ডেকে পাঠানো এবং মুখোমুখি করে দেওয়াই ভাল। আফটার অল, তুমি তো অসূর্যম্পশ্যা নও!

রাণু চমকে ওঠা গলায় বলল, কী ব্যাপার?

জয়ন্তী ওর কাঁধে হাত রেখে বললেন, আমি এখনও বুঝতে পারছি না, বাড়াবাড়ি করে ফেললাম নাকি। কারণ তোমাদের সমাজের রীতিনীতি তত জানা নেই আমার। সেই ভদ্রলোক এসেছেন।

রাণু জয়ন্তীর পায়ের দিকে তাকিয়ে রইল।

জয়ন্তীর মনে হল, ভীষণ নারভাস হয়ে পড়েছে রাণু। আশ্চর্য, সেই কবে থেকে মেয়েটিকে দেখছেন, যত শান্ত প্রকৃতির হোক, সবসময় স্মারট আর সাহসী। অনেক মুসলিম মেয়ে এ স্কুলে পড়েছে। পাশ করে বেরিয়ে গেছে। তাদের কেউ কেউ পরে কলেজেও পড়েছে। এখন কে কোথায় আছে, জানেন না জয়ন্তী। কিন্তু রাণু তাদের চেয়ে অনেক আলাদা। এমন কী ওর বোন বুলির চেয়েও আলাদা। জয়ন্তীর ধারণা, রাণুর মধ্যে মুসলিম মেয়েদের চেয়ে যেন হিন্দু মেয়েদের আদলটাই বেশি। তাকে কিছুতেই মুসলিম মেয়ে বলে চেনা যায় না। কথা বললেও না। এ নিয়ে রাণুর সঙ্গেও তাঁর কত আলোচনা হয়েছে।

জয়ন্তী বললেন, তোমাকে খুব মডার্ণ বলেই জানি রাণু। অবশ্য এসব ক্ষেত্রে সব মেয়েই···

রাণু হাসবার চেষ্টা করে বলল, ওকথা না। বিয়ে-টিয়ের ব্যাপারে আমার নিজের বলার কিছু নেই, বড়দি।

জয়ন্তী হাসলেন।···দেখ, আমি এসব ব্যাপারে সত্যি বড় আনাড়ি। মোজাম্মেলকে অনেকদিন থেকে চিনি-জানি। সে যে এখনও বিয়ে করেনি, তা কিন্তু জানতাম না। জানলাম ওর চিঠিতে। তারপর ও হুট করে এসে পড়েছে। কাল তোমার বাবা গিয়ে কথাবার্তা বলে এসেছেন বলল। কিন্তু তোমার বাবার হাবভাবে ওর সন্দেহ হয়েছে, ব্যাপারটা আর এগুবে না হয়তো। তাই আমাকে ধরতে এসেছে। এক্ষেত্রে আমি কতটুকু কী করতে পারি ভেবে পাচ্ছিলুম না। শেষে মনে হল, তোমাকে ডেকে পাঠাই। মুখোমুখি কথা বলে তোমরাই ঠিক করে নাও।

রাণু দরদর করে ঘামছিল। বড়দির মতো বয়স্কা, বুদ্ধিমতী, জ্ঞানী মহিলা এমন একটা কাণ্ড করে বসবেন, সে ভাবতেও পারেনি। কুতুবগঞ্জ কি কলকাতা? মফস্বলের এ সমাজ কি রাতারাতি অতটা বদলে গেছে? বড়দি কেন বোঝেন না, অতি স্মারট ও উচ্চশিক্ষিতা কোনো হিন্দু মেয়ের পক্ষেও ব্যাপারটা ভারি অস্বস্তিকর!

রাণু চাপা নিঃশ্বাস ফেলে হঠাৎ তৈরি হওয়ার ভঙ্গিতে বলল, আপনার অসম্মান করতে পারব না বড়দি। আলাপ করছি গিয়ে। কিন্তু···সে হাসল। কিন্তু কোনো আজেবাজে কথা নয়।

জয়ন্তী হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, আমি তোমার মায়ের মতো রাণু। তোমার ভবিষ্যৎ ভেবেই এই ইণ্টারভিউ বাঞ্ছনীয় মনে করেছি। তবে তুমি যখন বলছ, আমি কোনো কথা তুলব না। মোজাম্মেল যদি তুলতে চায়, সে কিন্তু তোমায় সামলাতে হবে। এস।

সোফার কোণার দিকে মোজাম্মেল একটা পত্রিকা উঁচুতে তুলে পড়ছিল। চোখে কড়া পাওয়ারের চশমা। মাথায় লম্বাচওড়া টাক। পরনে প্রচণ্ড সাদা প্যাণ্ট-শার্ট। পাশে একটা সুদৃশ্য নকশি কাপড়ের ব্যাগ। বইটা রেখে সে সোজা হয়ে বসল। রাণুর উদ্দেশে হাত তুলে মাথাটা একটু ঝুঁকিয়ে বলল, আদাব!

রাণু নিঃশব্দে হাতটা কপালে ঠেকাল। জয়ন্তী বললেন, মোজাম্মেল, এই আমার রাণু—রাণু, তোমার আসল নামটা বড্ড ভুলে যাই, তুমি নিজের মুখে জানিয়ে দাও।

রাণু উল্টো দিকে সোফাতে বসে বলল, গুলশন-আরা।

মোজাম্মেল হাসল।···বেগমটা বাদ দেবেন না। খানদানী ঘরের মেয়েরা বেগম হতে খুব ভালবাসেন। আমি অবশ্য নিছক চাষার ছেলে। লেখাপড়া না শিখলে মোজাম্মেল শেখ হতাম। আপনি রাগ করছেন না তো আমার কথা শুনে?

রাণু আস্তে বলল, না। সে চোখের কোণা দিয়ে মোজাম্মেলের দিক দেখছিল।

জয়ন্তী বললেন, তোমরা গল্প করো। আমি আসছি। এবেলা আমার কমলারাণী আসেনি। আজ আমায় ভোগাবে।

জয়ন্তী চলে গেলে মোজাম্মেল বলল, আপনাকে আমি রবীন্দ্র-জয়ন্তীতে দেখেছিলাম। প্রথমে দেখে বুঝতেই পারিনি আপনি মুসলিম মেয়ে। হয়তো আমি জানতেও পারতাম না সেটা, যদি না

আপনার বোন গান গাইতেন। নামটা ঘোষণা করল, তখন জানলাম মুসলিম মেয়ে। খুব ভাল লাগল। তখন বড়দিকে জিগ্যেস করলাম আপনার বোনের কথা। বড়দি বললেন, বিয়ে হয়ে গেছে কোথায় যেন। আর আপনাকে দেখিয়ে বললেন, ওই মহিলা এর বড় বোন। ভাবলাম, আপনার সঙ্গে আলাপ করি। কিন্তু আপনি তখন বড় ব্যস্ত।

রাণু ঠোঁটের কোণায় হাসল।···মুসলিম মেয়েদের প্রতি আপনার খুব আগ্রহ তাহলে ?

মোজাম্মেল সিরিয়াস ভঙ্গিতে বলল, আগ্রহ তো বটেই। আমার ভাল লাগে, কোথাও শিক্ষিতা মুসলিম মেয়েকে বিশেষ করে কোনো ফাংশনে গাইতে, আবৃত্তি করতে বা ধরুন, উদ্যোগ নিতে দেখলে। যেমন আপনার রোল সেদিন দেখছিলাম। জানেন ? নবাবগঞ্জে গত ইলেকশানে একজন মুসলিম মেয়ে দাঁড়িয়েছিলেন—তাঁর জন্যে আমি ক্যাম্পেন পর্যন্ত করে বেড়িয়েছিলাম। অথচ আমি রাজনীতি করি না।

রাণু বলল, আপনার ফ্যামিলির মেয়েরা নিশ্চয়ই শিক্ষিতা ?

মোজাম্মেল মুষড়ে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে। জোরে মাথা নেড়ে বলল. সেখানে আমি প্রচণ্ডভাবে ব্যর্থ। স্রেফ নিজে যেটুকু লেখাপড়া শিখেছি, সেটাই ফ্যামিলির ইচ্ছার বিরুদ্ধে। লড়াই করে এখানে পৌঁছেছি। আব্বা আমার হাতে লাঙল কোদাল তুলে দিতে চেয়েছিলেন। আসলে কী জানেন, আমাদের সমাজের চোখে ছানি পড়ে গেছে। চারপাশে কী ঘটছে, দেখতে পায় না। ভাবতে পারেন, ইসলামপুর কলেজে এখন অব্দি মোটে তিনটি মুসলিম মেয়ে ?

রাণু জানালার বাইরে দূরে পামগাছের দিকে তাকিয়ে রইল।

মোজাম্মেল বলল, আপনার আব্বা কাল গিয়েছিলেন। খুব প্রগ্রেসিভ মানুষ। কিছুটা পথ এগিয়ে দিলাম। সেই সময় অনেক কথা হল। আপনাদের ফ্যামিলির ইতিহাস শুনলাম। আপনার অনেক গল্পও বললেন।

কী গল্প ? রাণু আনমনে বলল।

মোজাম্মেল হাসল।...সে অনেক। যাই হোক, একটা আশ্বাস আমি দিতে পারি, আপনার কেরিয়ারে হস্তক্ষেপ করব না। বড়দিকে একটু আগে সেকথাই বলছিলাম। অবশ্য কাল, আমার বড়ভাইদের মুখ চেয়ে আপনার চাকরি ছাড়ার কথায় সায় দিতে বাধ্য হয়েছিলাম। বুঝতেই পারছেন তার কারণ। কিন্তু পরে মনে হল, আব্বার কাছে শুনে আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন। তাই আমাকে ছুটে আসতে হল। বড়দির শরণাপন্ন হলাম।

মোজাম্মেল হাসতে লাগল। রাণু উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আসছি।

জয়ন্তী কিচেনে চা করছিলেন। রাণুকে দেখে বললেন, চলে এলে যে ?

রাণু হাসল।...মাথা ধরে গেছে। ভদ্রলোক বড্ড বেশি কথা বলেন।

জয়ন্তী বললেন, হ্যাঁ। ওটা ওর সরলতা, বুঝলে রাণু আমার সঙ্গে বহরমপুরে একটা কনভেনশানে আলাপ হয়েছিল। তারপর থেকে চিঠিপত্র লিখত-টিখত। দিদি বলত। এখন বড়দি বলে সবার দেখাদেখি। আমার মনে হয় রাণু, তুমি পজিটিভ ডিসিশান নাও। আমার মতো দোনামোনা করলে একদিন দেখবে চুল পেকে যাচ্ছে, কোথাও পৌঁছতে পারছ না।

রাণু দ্রুত বলল, আপনি বিয়ে করেননি বলে পস্তান বুঝি ? কই, এমন কথা তো এতকাল শুনিনি।

জয়ন্তী হাসলেন।...মোটেও না। কিন্তু সবাই তো জয়ন্তী সান্ন্যাল নয়, রাণু। আমি নিয়তি মানিনে, রাণু। মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি। অথচ কখনও-কখনও টের পাই, সে স্বাধীনতা নিজের অজানতে কখন তছনছ হয়ে গেছে। তবে থাক এসব কথা ! তোমার ভালর জন্যে বলছি রাণু, তুমি ডিসিশান নাও। ঠকবে না।

রাণু একটু চুপ করে থেকে বলল, আমার কী করার আছে ? মাথার ওপর বাবা আছেন।

তোমার বাবার নিশ্চয় অমত হবে না। তাহলে উনি ইসলামপুরে যেতেন না কথা বলতে। নাও, তুমি চা-টা করে নিয়ে এস। ওকে সান্ত্বনা দিই গে।···বলে জয়ন্তী বেরিয়ে গেলেন কিচেন থেকে।

রাণু আবার নার্ভাস বোধ করছিল। গরম জল ছলকে পড়ল পট থেকে।

পাটোয়ারিজীর গদীর সামনে ফাঁকা চত্বরে স্টেজ বাঁধা হয়েছে। ফ্লাডলাইটের আলোয় জায়গাটা যেন দিনদুপুর হয়ে উঠেছে। সন্ধ্যা হতে না হতেই কাচ্চাবাচ্চারা এসে জড়ো হয়েছে। চেঁচামেচিতে কান পাতা দায়। গোড়াবাঁধানো বটগাছের তলায় চাওয়ালা পান-বিড়িওয়ালা চানাচুরওয়ালারা এসে মেলার আমেজ ফুটিয়ে তুলেছে। একটু তফাতে নিরালা জায়গায় দাঁড়িয়ে নাজিম সিগারেট টানছিল। রাজামিয়ার বোঁচকাবুঁচকি একটু আগে রিকশোয় আনা হয়েছে। রাজামিয়া স্টেজের পেছনে একফালি জায়গায় গ্রীনরুম বানিয়ে মেকআপে বসেছে। ভিড়ভাট্টা আর আলোর জেল্লায় নাজিমের মাথা ধরেছে। মনটাও চাঙ্গা নেই। মাথার ভেতর কাশেম জুয়াড়ীর মেয়ের কথাগুলো ঘুরছে। অস্থির করছে সারাক্ষণ। মুন্নী যেন হাত কাটা ব্লাউস আর জংলী শাড়ি পরে আবছা ঘুরে বেড়াচ্ছে এপাশে-ওপাশে অন্ধকারে—এমন চাউনিতে নাজিম অন্ধকারের দিকটায় তাকিয়ে আছে।

মুন্নীর কাছে খবর নিশ্চয় পেয়েছে কাশেম জুয়াড়ী। মুখে যতই বলুক, এমন হাতের কাছের আসর ছাড়বার পাত্র সে নয়। চলে আসবে জুয়োর ছক বগলদাবা করে।

আর সে এলেই যা থাকে বরাতে, নাজিম পীরতলার দিকে ছুটে যাবে। শেষ বাস ছাড়তে এখনও আধঘণ্টা দেরি।

কিন্তু কাশেমের পাত্তা নেই।

নাজিম থমকে দাঁড়াল। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না। রাঘবের চায়ের দোকানে বাইরের বেঞ্চে কাপ-প্লেট হাতে নিয়ে

আছে জুয়াড়ীর বেটি। হাতের পাশে ঝুলছে ভ্যানিটি ব্যাগ, পরনে অতিকায় ভব্য শাড়ি এবং লম্বাহাতা ব্লাউস। কপালে মোটা লাল টিপ। একেবারে বাবুবাড়ির মেয়েটি। নাজিম এমন চেহারায় মুন্নীকে কখনও দেখেনি। ভাবছিল, ভুল হচ্ছে না তো? স্টেশন এলাকায় বাজার। তাছাড়া ওই বাসস্ট্যানড। সবসময় নানা জায়গার মেয়ে-পুরুষ, শিক্ষিত বা নিরক্ষর, গ্রাম্য বা শহুরে, কতরকম লোকের আনাগোনা। মুন্নীর দিকে অত নজর পড়ার কথা নয় কারুর, যদিও তার স্বাস্থ্যে ও চেহারায় কী একটা আছে—যা চোখে পড়লে পুরুষমানুষের মন চনচন করা স্বাভাবিক।

নাজিমকে দেখতে পেয়েই হেসেছে মুন্নী। কাপ-প্লেট রেখে উঠে দাঁড়িয়েছে। নাজিম কাছাকাছি হতে না হতে চায়ের দাম প্রায় ছুঁড়ে দিয়ে এগিয়ে এসেছে।

চলে তো এলাম। কিন্তু বাড়ি ফিরব কেমন করে, সেই ভাবনা হচ্ছিল। বাস ফের সেই ভোর পাঁচটায়।…বলে মুন্নী হাঁটতে লাগল।

নাজিম বলল, ওদিকে কোথায় যাচ্ছ?

মুন্নী দাঁড়াল।…রাজা হরবোলার শো কোথায় হচ্ছে আমি কি জানি? তুমি বলছ না তো কিছু।

নাজিম হাসল।…জান না তো বুলেটের মতো ওদিকে ছুটছ যে?

মুন্নী চঞ্চল চোখে চারদিক দ্রুত দেখে নিয়ে বলল, এই। লোকে তাকাচ্ছে!

নাজিম শক্তমুখে বলল, তাকাক। আসতে পেরেছ এমন করে, তাকালে দোষ কী?

শোয়ের দেরি আছে! চলো, নিরিবিলিতে গঙ্গার ধারে বসি।

মাথায় কোনো মতলব নেই তো?

জানি না।

মুন্নী গলার ভেতর বলল, আমার কাছে চাকু আছে।

নাজিম ঠাণ্ডা গলায় বলল, চাকু অনেক খেয়েছি মুন্নী। মরিনি। ওসব কথা থাক। ওস্তাদ তোমাকে একা ছেড়ে দিলে?

হ্যাঁ। বললাম, কুতুবগঞ্জে রাজা হরবোলার শো দেখতে যাব। বললে যাও।

মিথ্যে বলো না। লুকিয়ে এসেছ।

মাঝিমাল্লাদের বস্তির পেছন দিয়ে রেললাইনের ধারে ধারে ওরা হাঁটছিল। দূরের লাইটপোস্ট থেকে আলো এসে পড়েছে এদিকটায়। বস্তি ছাড়িয়ে বুড়িমাতলায় পৌঁছে নাজিম বলল, নির্ভয়ে বসো।

মুন্নী বলল, ভয় করলে আসতাম না। এই, টর্চবাতিটা জ্বালো না?

নাজিম প্যান্টের পকেট থেকে আধেক বেরুনো টর্চটা টানল। জ্বেলে জায়গাটা দেখে নিয়ে বসল শেকড়ের ওপর। মুন্নী সামনে আরেকটা শেকড়ে বসল।

নাজিম বলল, ওস্তাদকে লুকিয়ে এসেছ, খুঁজতে বেরুবে দেখবে। বলা যায় না, কুতুবগঞ্জে এসে হাজির হতে পারে।

মুন্নী একটু চুপ করে থেকে বলল, আসবে না। সন্ধ্যার আগে বেরিয়েছি। বলে এসেছি, খালার (মামির) বাড়ি পাঁচগা যাচ্ছি।

বিশ্বাস করল?

কেন করবে না? কতবার আমি খালার বাড়ি যাই।

নাজিম সিগারেট ধরাল। মুন্নী হাত বাড়িয়ে বলল, এই! আমাকে একটা দাও!

নাজিম হাসতে হাসতে সিগারেট দিল। লাইট জ্বেলে ওর মুখের কাছে ধরে সেই আলোয় ওকে দেখতে দেখতে ফের বলল, ভাগ্যিস, তোমাদের গাঁয়ের বুড়িদের মতো মাটির হুকো খাওনা!

মুন্নী ফোঁক ফোঁক শব্দ করে টেনে সিগারেটটা ছুড়ে ফেলল। গঙ্গার জলে পড়ে নিভে গেল সেটা।

নাজিম বলল, ফেলে দিলে যে?

খেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু ভাল লাগে না।

মুন্নী!

উঁ?

তোমার ছাড় হয়ে গেছে ?

হুঁউ।

কী ভাবছ ?

মুন্নী হাসল। গলার ভেতর শ্বাসপ্রশ্বাস মিশিয়ে বলল, হঠাৎ এমন করে চলে এলাম কেন ভেবে পাচ্ছিনে। আজকাল আমার কী যে হয়! ঘর আমাকে কামড়ায়। পায়ের তলায় চাকা বেঁধে দিয়েছিল বাবু, সেই ছোটবেলায়। এক জায়গায় থাকতে পারিনে। কী করব, কী হবে আমার, সেই ভাবনা!

নাজিম এগিয়ে গিয়ে পাশে বসে কাঁধে হাত রাখল। মুন্নী হাতটা সরিয়ে দিল। নাজিম গ্রাহ্য করল না। বলল, আমারও শালা তাই! তোমার তো পায়ে চাকা। আমার শালা হাতেও চাকা।

মুন্নী বলল, চুপ। লোক আসছে।

নাজিম হাসতে হাসতে বলল, কোন শালা কুকর্ম করতে আসছে। দেখ না, অন্যদিকে সরে যাবে। বলে সে টর্চ জ্বেলে লোকটার ওপর ফেলল।

লোকটা চোখে হাত ঢেকে সত্যি সত্যি অন্য পাশে সরে গেল। বলল, কে হে বাপু ?

নাজিম বলল, আমি নাজিম।

লোকটা এগিয়ে গেল ঝোপের আড়ালে।

নাজিম ফের ওর কাঁধে হাত রাখল। বলল, মুন্নী, তোমাকে বিয়ে করব। বলো, তুমি রাজি ?

মুন্নী হাতটা তেমনি করে সরিয়ে উঠে দাঁড়াল।···বিয়ে করে তারপর আমাকে ছুঁয়ো।

নাজিম চটে গেল। বসে থেকেই বলল, বিয়ে না করে তোমার ইজ্জত নষ্ট করবে না নাজিম। গায়ে হাত দিলে ইজ্জত নষ্ট হয় না। আর, অত যদি সতীলক্ষ্মী, এমন করে এলে কেন ?

ঝগড়া করবে, না আসবে ?

কোথায় যাব ?

শো দেখতে।

তুমি যাও। আমি দেখেছি।

মুন্নী কাছে ফিরে এসে একটু ঝুঁকে ওর হাত টানল।…রাগ করেছ ?

আমার রাগে কী এসে যায় তোমার ?

মুন্নী দুটো হাত টেনে ওকে দাঁড় করাল। তারপর হিসহিস করে বলল, তুমি জানো না, মেয়েমানুষ যখন এমন করে পুরুষমানুষের কাছে আসে, তখন ইজ্জত সঙ্গে নিয়ে আসে না।

ছয়

ভোরবেলা মসজিদে নমাজ পড়তে গিয়েছিলেন মবিনকাজি। বাড়ি ঢুকে বললেন, খোনকার হারামজাদার সঙ্গে একচোট হয়ে গেল। ওকে বড়মুখ করে কথাটা বলতে গেলাম, উল্টে জবান করে বসল।

জোহরা যথারীতি চায়ের সরঞ্জাম সামনে রেখে মোড়ায় বসে আছেন। বললেন, তুমি আর লোক পেলে না কথা বলার ?

আহা, বলতে হবে না পাঁচজনকে ? কাজিসায়েব রান্নাঘরের বারান্দার মেঝেয় বসে পা ঝুলিয়ে দিলেন। খোনকার আমাকে জ্ঞান দিতে এল, জানো ? বলে, কলেজের মাস্টার হলে কী হবে ? ওরা যে আতরাক (নিচুজাত)। খানবাহাদুরের আশরাক (উঁচুজাত) ইজ্জত নাকি তাঁর ছেলে হয়ে আমি জলাঞ্জলি দিতে যাচ্ছি। শোনো কথা! অত লোকের সামনে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল, আমি চাষার ঘরে মেয়ের বিয়ে দিচ্ছি। কাজেই খোনকার আমার মেয়ের বিয়েতে আসবে না।

জোহরা চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে শান্ত গলায় বললেন, খোনকার সায়েব কোন্ ভাল জাতের ঘরে মেয়ে দিয়েছেন, আমরা তো জানি। বাকিগুলো কোন্ জাতে দেবেন, তাও দেখব।

কাজিসায়েব চায়ের কাপে ঠোঁট ঠেকিয়ে নামিয়ে নিলেন হঠাৎ। চাপা গলায় বললেন, কিন্তু এদিকে আরেক কাণ্ড হয়েছে জানো? তোমার শয়তান বেটা এবার বাকি ইজ্জতটুকুও ধুলোয় লুটিয়ে দিচ্ছে।

জোহরা ভুরু কুঁচকে নিষ্পলক তাকিয়ে বললেন, নাজু? কী করেছে?

কাল সারারাত একটা মেয়ের সঙ্গে স্টেশনের প্ল্যাটফরমে আড্ডা দিয়েছে।...কাজিসায়েব গলার স্বর আরও খাটো করলেন। চাঁদু জমাদার বলল। মেয়েটা নাকি পীরতলার কাশেম জুয়াড়ীর বেটি।

জোহরা বিশ্বাস করলেন না।...চাঁদু হারামী কাকে দেখতে কাকে দেখেছে। ওর কথা ছাড়ো।

মাথা দোলালেন মবিনকাজি।...চাঁদু ঠিকই দেখেছে। মাঝে মাঝে কানে আসত, পীরতলায় গাড়ি থামিয়ে নাজু নাকি কাশেমের বাড়ি যায়। নেশাভাং করে সেখানে। কিন্তু এ রোগের কী প্রতিকার?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাজিসায়েব জুড়িয়ে যাওয়া চা সরবতের মতো খেতে থাকলেন। জোহরা গম্ভীর মুখে বললেন, নাজু বাড়ি ফিরুক, শুধোব।

কাজিসায়েব উদাসীন হয়ে গেলেন হঠাৎ।...ছেড়ে দাও। ওর ভরসা তো ছেড়েই দিয়েছি।

জোহরা কড়া স্বরে বললেন, আমি ছাড়িনি। জুয়াড়ীর বেটি ঘরে তুলবে নাজু, আমি বেঁচে থাকতে? আর কথাটা যদি মিথ্যে হয়, ওই হারামী চাঁদুকে আমি নাজুর পয়জার খাওয়াব।

গতিক দেখে মবিনকাজি ভয় পেয়ে গেলেন।...তোমাকে কিছু বলাই দেখছি মুশকিল। রাণুর বিয়ের মুখে এখন ওসব হট্টগোল বাধিও না তো! ভালয় ভালয় চুকে যাক সব। তারপর বরং নাজুকে সাফ কথা বলে দেব, যা খুশি করবে করো—খানবাহাদুরের বাড়ির ত্রিসীমানায় নয়।

কাজিসায়েব উঠে দাঁড়ালেন। রাণু ওঠেনি?

উঠেছে। রাজামিয়াকে খোজা গোরস্তান দেখাতে নিয়ে গেছে।

রাজামিয়ার সঙ্গে ?

হ্যাঁ।

তুমি কিছু বললে না ?

কী বলব ?

বেগানা (অনাত্মীয়) পুরুষের সঙ্গে এমনি করে চলে গেল রাণু ?

জোহরা দীর্ঘ তিন মিনিট কোনো কথা না বলে এটা-ওটা নাড়াচাড়া করছিলেন। রান্নাঘরে ঢুকলেন। বেরিয়ে এলেন। তারপর বললেন, যোয়ান বেটি। কচি খুকি তো নয়। এতকাল ধরে লেখাপড়া শিখেছে। এখানে-ওখানে ঘুরেছে। একবার শান্তিনিকেতন বেড়িয়ে এল। একবার সেই জয়পুর পর্যন্ত বেড়িয়ে এল গুণমালাদের সঙ্গে। অতদিন বাইরে থেকে বি টি পড়ল। তখন কথা হয়নি। এতদিন বাদে মিয়ার হুঁশ হয়েছে।

কিন্তু···বলে চুপ করে গেলেন মবিনকাজি।

জোহরা বললেন, বেগানা পুরুষের সঙ্গে গেল ! হুঁঃ ! বছরের পর বছর ডেলিপ্যাসেনজারি করে বহরমপুর কলেজে গেছে। চোখের আড়ালে কী করবে, তখন খেয়াল হয়নি ?

কাজিসায়েব ফুঁসে উঠলেন।···রাণু-বুলির নামে আজ পর্যন্ত এক-ছিটে কালি ছড়াতে পারেনি কেউ। কাজিবাড়ির বেটিরা তেমন নয়।

তা যদি জানো, তাহলে আর লম্ফঝম্ফ করছ কেন ? নিজের চরকায় তেল দাও গে।

কাজিসায়েব মুখ নামিয়ে আস্তে বললেন, আহা ! একটা শুভ-কাজের মুখে কে নিন্দেমন্দ রটাবে। দামাঁদমিয়া শুনে হয়তো বিগড়ে বসবে। নিজে যেচে এল। রাণুর বড়দি পর্যন্ত কাজিবাড়ি এলেন—এতকাল কত বলেছি, মুখেই যাব-যাব করতেন। সেজন্যেই বলছি। রাণুর এখন ওভাবে বেরুনো ঠিক হয়নি।

খোজা গোরস্তানের বিশাল গেটের সামনে রিকশো থেকে নেমে রাণু বলল, খুব শীগগির এসে গেলাম। পেছনে হাওয়া ছিল বলে !

রিকশোওলা সালাম বলল, আপনারা ঘুরুন। আমি ফিরোই ততক্ষণ।

ওপাশে গঙ্গা। কুমড়োর ক্ষেত এসে পাঁচিলে শেষ হয়েছে। কয়েক একর জায়গা জুড়ে উঁচু পাঁচিলে ঘেরা গোরস্তান। ফটকের দরজা হাট করে খোলা। বিশাল কবাট কারা কবে কেটে নিয়ে গেছে। ভেতরে ঘাস, উলুকাশ, আগাছার জঙ্গল। রাজামিয়া বলল, যেখানে যাই, ঐতিহাসিক চিহ্ন আমায় ভীষণ টানে। কিন্তু যা জঙ্গল দেখছি, সাপটাপ নেই তো?

রাণু বলল, কে জানে! ছোটবেলায় আমরা দলবেঁধে এখানে কুল খেতে আসতাম। অনেক কুলগাছ ছিল। এখনও কয়েকটা আছে। ওই দেখছেন!

রাজামিয়া পা বাড়িয়ে বলল, ইস্! কী দুর্গতি হয়েছে কবর-গুলোর! সবই খোজাদের নাকি?

হ্যাঁ। মুরশিদাবাদের নবাবের খোজা বান্দাদের কবর।

কালো পাথরের কবর ঘিরে ধরেছে আগাছার ঝাড়। একটু ঝুঁকে একটা কবর দেখতে দেখতে রাজামিয়া বলল, একটু কথা বলব ওদের সঙ্গে? দেখবেন, কেমন চোস্ত উর্দু জবানে জবাব দেবে!

রাণু দ্রুত বলল, না, না। প্লীজ! ওদের অসম্মান করা ঠিক নয়।

রাইট, রাইট।···পিছিয়ে এল রাজামিয়া। একটু হাসল।··· ভেনট্রিলিকুইজম আমায় পেয়ে বসেছে। সব সময় ইচ্ছে করে, নিজেকে ধোঁকা দিয়েও মৃতদের সঙ্গে কথা বলি। বাই দা বাই, রাণু বেগম কি ভূত বিশ্বাস করেন?

রাণু হাল্কা চটুল স্বরে বলল, ওসব ভেবে দেখিনি কোনোদিন।

আপনি নমাজ পড়েন না?

আপনি?

রাজামিয়া মুখ তুলে আকাশ দেখতে দেখতে বলল, আমি সুফি মতে ধ্যান করি। কখনও গান গেয়েও খোদার বন্দেগি (উপাসনা) করি। কিন্তু জানেন? নমাজ পড়লে মনে শান্তি আসে। একসময়

আমি রেগুলার নমাজ পড়তাম। আসলে নমাজ সামাজিক উপাসনা। নিভৃতে খোদাকে অনুভব করতে চাইলে সুফি মতই বেস্ট।

সকালে নরম সোনালী রোদ পড়েছে রাজামিয়ার মুখে। গায়ে নীলচে স্পোর্টিং শার্ট, পরনে সাদা প্যাণ্ট, পায়ে নীল-সাদা ডোরাকাটা কেডস। বাঁহাতে একটা স্টিলের বালা এবং গলায় সরু সোনার চেন। চোখে চোখ পড়তেই রাণু চোখ নামাল। বলল, ভেতরে ঘোরা যায়। চলুন না।

মাঝে মাঝে রাজামিয়া কেমন সিরিয়াস হয়ে ওঠে, লক্ষ্য করেছে রাণু। কত বিষয়ে ওর জানাশোনা, কত দেশ নাকি ঘুরেছে। রাণু তার জীবনে খুব বেশি পুরুষমানুষের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পায়নি।

রাণু নির্জন খোজা গোরস্তানের ভেতর হাঁটতে হাঁটতে টের পাচ্ছিল, তার মধ্যে কী এক স্বাধীনতা নড়াচড়া করে উঠেছে। এই স্বাধীনতা তাকে প্রগলভ, চঞ্চল আর বেপরোয়া করে তুলতে চাইছে।

রাজামিয়া বলল, একটা উর্দু গজল আছে জানেন? যার বাংলা হল, সারাজীবন তুমি কবর থেকে দূরে পালাতে চাইছ, কিন্তু ওহে বেওকুফ! কবর তো সবসময় তোমার পায়ের তলায়!

রাণু বলল, সুন্দর তো কথাটা!

শুনুন তাহলে।···রাজামিয়া গজল গাইতে থাকল।

বুলির হারমোনিয়ামটা খারাপ হয়ে গেলে আর সারানো হয়নি। বুলি বলে গেছে ওটা বেচে দিতে। রাণুর গান আসে না। বুলি দারুণ গাইত। ধরণীবাবু মারা গেলে বুলির ক্লাসিক শেখা বন্ধ হয়ে যায়। একটা গানের স্কুল হয়েছিল পরে। কিন্তু বুলিকে সেখানে যেতে দেননি কাজিসায়েব। ওখানে নাকি বেলেল্লা ছোকরা আর মেয়েদের আখড়া। বুলি রেডিওতে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনে শুনে শিখে নিয়েছিল। মেয়েদের স্কুলেও শেখানো হয়। কিন্তু গানের দিদিমণির চেয়ে ভাল গাইত বুলি। তাই ওকে ভদ্রমহিলা কেমন যেন অপছন্দ করতেন। মিছিমিছি ভুল ধরতেন। রাগ করে বুলি গানের ক্লাসে

আর যেত না। ধরণীবাবুর 'সঙ্গীত শিক্ষায়তনে' মাসে দশ টাকা মাইনে দিয়ে গান শিখত। কলেজে ঢোকার পর বুলি বাড়িতেই রোজ গানের চর্চা করত। বুলি বলত, তবলার সঙ্গে না গেয়ে অভ্যাস খারাপ হয়ে যাচ্ছে। রাণু আপা, তুই তবলা শেখ না! কোনো কোনো রাতে হঠাৎ কাজিসায়েব মেয়েকে ডেকে বলতেন, বুলি' সেই গানটা গাও তো বেটি! রবিঠাকুরের সেই গানটা!—'আকাশ ভরা সূর্য তারা!'

কিন্তু নৌকো করে বেড়ানোর সময় অবাধ স্বাধীনতা। বুলির বিয়ের পরও নৌকো আর মাইকভাড়া করে রাণু দলবল জুটিয়ে বহরমপুর অব্দি গিয়েছিল। ফিরতে রাত দুপুর। স্কুলের অঞ্জলি দিদিমণি, কমলা, চৌধুরীবাড়ির মেয়ে জ্যোৎস্না ওরফে নূরজাহান। আর ছেলেদের মধ্যে পাটোয়ারিজীর ছেলে বিমল, বড়দির কে এক আত্মীয় রঞ্জনবাবু—তিনিই তবলা বাজিয়েছিলেন। বেচারী নূর-জাহানেরও বিয়ে হয়ে গেছে।

গজল শেষ করে রাজামিয়া ডাকল, বেগমসায়েবা!

রাণু চমকে উঠেছিল। হাসল।···বেগমসায়েবা-টায়েবা বললে বড্ড খারাপ লাগে কিন্তু!

শুধু নাম ধরেই বা ডাকি কোন্ আক্কেলে?

ডাকতে পারেন। সবাই ডাকে।

চেষ্টা করব। কিন্তু কেমন লাগল বললেন না?

কী?

গজল।

আপনি তো দারুণ গাইতে পারেন।

পারি। কিন্তু আপনি মোটেও শুনছিলেন না।

আপনি কি থটরিডিংও জানেন?

শুকনো হাসি জোরালো করে রাজামিয়া বলল, হতভাগ্য খোজা বান্দাদের দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে আর বেশিক্ষণ থাকতে ইচ্ছে করছে না। চলুন, খাজাসায়েবের দরগায় যাই বরং।

রাণু বলল, পথে একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখতে পারেন। খুব ইণ্টারেসটিং।

কী বলুন তো?

পঞ্চমুখী শিবের মন্দির।

সেটা কী?

রাণু হাঁটতে হাঁটতে বলল, শিবের তো একটা মুখ। কিন্তু এ শিবের পাঁচটা মুখ। তাই পঞ্চমুখী। গঙ্গার পাড়ে—খুব সুন্দর আশ্রমের মতো সাজানো জায়গাটা! আমার তো খুব ভাল লাগে।

রাজামিয়া ফটক পেরিয়ে সিগারেট ধরাল। তারপর বলল, হিন্দুদের সংসর্গে থেকে আপনি অনেক হিন্দুয়ানি রপ্ত করেছেন টের পাচ্ছি।

হিন্দুয়ানি-মুসলমানি আমি বুঝিনে। রাণু মনে মনে একটু আহত হয়ে বলল। আমি তো শিবপূজো করিনে হিন্দু মেয়েদের মতো। ব্যাপারটা আর্ট বলে মেনে নিতে আপত্তির কারণ দেখিনে। তাছাড়া পঞ্চমূর্তি শিবের ব্যাপারে একটা দারুণ ইতিহাসও আছে।

চটে গেলেন? রাজামিয়া রিকশোর দিকে এগিয়ে গেল। জাস্ট একটু বাজিয়ে নিলাম আপনাকে। চলুন, পঞ্চমুখী শিবমন্দির দেখে আসা যাক।

রাণু বলল, থাক। খাজাসায়েবের দরগায় চলুন বরং! চলো, সালামভাই!

নেভার। রিকশোওলা, পঞ্চমুখী শিবমন্দির! স্টার্ট। ওঁর কথা শুনো না।

সালাম রিকশোওলা রাণুর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। রাণু গোঁ ধরে বলল, না—খাজাসায়েবের দরগা।

রিকশো চলতে থাকল কাঁচা রাস্তায়। একটু পরে রাজামিয়া বলল, আপনি খুব জেদী মেয়ে।...

জীবনে একেকটা সময়, কোনো একটা সকাল বা বিকেল, অথবা গঙ্গার ধারে কোনো এক সন্ধ্যা, রাণুর খুব অর্থপূর্ণ মনে হয়। মানুষ

হয়ে জন্মের এক বিরাট আর অঢেল আনন্দ নাগালের বাইরে রয়ে গেছে, হঠাৎ কীভাবে সেই আনন্দের খানিকটা ছিটকে চলে আসে হাতের মুঠোয়। রাণুর স্বভাব, আনন্দের সেই টুকরো যতক্ষণ হাতের মুঠোয় থাকে, ততক্ষণ সে খুবই বেহিসেবী।

খাজাসায়েবের দরগায় পৌঁছে রাণুর মনে হল, রাজামিয়া তাকে জেদী মেয়ে বলেছে—সত্যি, বেশি জেদ দেখানো হয়ে গেছে। হয়তো নিছক কথার কথা হিসেবেই রাজামিয়া তার হিন্দুয়ানি নিয়ে তামাসা করেছে। আজ সকাল থেকে মনে একটা চাপা আনন্দের আবেগ টলটল করছিল। একটা তুচ্ছ কথায় তাকে অস্বীকার করার মানে হয় না। হয়তো কিছু হিন্দুয়ানি তার মধ্যে এসেই গেছে, না আসাটাই অস্বাভাবিক। ছোটবেলা থেকে তার হিন্দুদের সঙ্গেই বেশি কেটেছে।

খাজা সায়েবের দরগা সবসময় ঘন ছায়ায় ঢাকা। উঁচু চত্বরের ওপর পাথরে বাঁধানো কবরে কাঠমল্লিকার ফুল ছড়িয়ে আছে। কয়েকটা মাদারগাছও লাল ফুল ফুটিয়েছে সারা গায়ে। এক পাশে বটগাছের তলায় 'সিন্নি' বেচছে একটা লোক। বাতাসা, মুড়কি, গুড়ের পাটালি আর ছোট ছোট মাটির ঘোড়া। এক ফকিরও পাথরের মালা, গিরি মাটি গুলে রাঙানো সুতো, আগরবাতি, শূন্য কবচের খোল, তামার আংটি সাজিয়ে বসে আছে। এগুলো কিনে নিয়ে দরগার খাদিমের (সেবক) কাছে গেলে তিনি খাজাবাবার কবরের সামনে হাঁটু মুড়ে বসবেন এবং কবরে জিনিসটা ঠেকিয়ে ফেরত দেবেন। আধিব্যাধি চলে যাবে দুশমন শায়েস্তা হবে। মামলায় জয় হবে। কত কী ঘটবে।

রাজামিয়ার ভক্তি দেখে রাণু অবাক। উঁচু দরগার সামনে কিছু চাওয়ার ভংগিতে দুটো হাত তুলে চোখ বুজে মনে মনে কিছু প্রার্থনা করল সে। ঠোঁট দুটো কাঁপছিল। রাণু ফকিরের থেকে এক প্যাকেট আগরবাতি কিনে আনল। প্যাকেটটা চত্বরের ওপর কবরের পাশে রেখে সে দেখল, রাজামিয়ার প্রার্থনা শেষ। আস্তে বলল, চলুন।

রাণু এগিয়ে গিয়ে রিকশোওলাকে বলল, সালামভাই, তুমি বরং চলে যাও। এখান থেকে আমরা হাঁটা পথে ফিরব। অসুবিধে হবে না।

ব্যাগ খুলে একটা দশ টাকার নোট গুঁজে দিল সে রিকশোওলার হাতে। রিকশোওলা জানে, কাজিসায়েবের বেটির হাত বরাবর দরাজ।

রাণু পা বাড়িয়ে বলল, আপনাকে এবার একটা আশ্চর্য জায়গায় নিয়ে যাব।

জায়গা আশ্চর্য হোক বা না হোক, আপনার মুড বদলেছে, এটাই খুশীর কথা।···বলে রাজামিয়া মুখ তুলে হঠাৎ ঘুঘু ডাকতে শুরু করল।

রাণু হেসে ফেলল।···কালরাতে স্টেজে মুরগীর ডাকটা কিন্তু দারুণ হয়েছিল।

ডাকব নাকি ?

হুঁউ।

দুধারে টুকরো-টুকরো চষা ক্ষেত। আম কাঁঠালের বাগান, আগাছার জঙ্গল। ওধারে গঙ্গা দেখা যাচ্ছে। তার ওপরে ধুধু সাদা মাটির মাঠ—কোথাও দাগড়া-দাগড়া খানিকটা সবুজ শস্য। বাবলা বনে গরু চরাচ্ছে গাঁয়ের রাখাল। মাঠ পেরিয়ে গেছে বিদ্যুতের লাইন, উঁচু ফ্রেম আকাশ ফুঁড়েছে। আকাশের গায়ে টানা চাবুকের দাগ যেন। সামনে এপারে জঙ্গলের ভেতর একটা গম্বুজ মাথা তুলে আছে। সেটা দেখিয়ে রাণু বলল, ওখানে যাব।

নানারকম পাখির ডাক ডাকছিল হরবোলা রাজামিয়া। রাণুর মনে হচ্ছিল, কীভাবে সময়ের উল্টোদিকে চলে এসেছে। সেই ছোটবেলার জীবনটার ভেতর হেঁটে বেড়াচ্ছে সে। অজস্র স্মৃতি পথের দুধারে দাঁড়িয়ে তাকে দেখছে। ডাকছে। চারপাশে চলছে তুমুল কী এক চাপা কোলাহল। রাণু বলল, ওখানে একবার আমরা ক'জন মেয়ে পিকনিক করতে এসেছিলাম। তখনও কিন্তু এলাকায়

্-একটা বাঘ দেখা যেত। গুজব ছিল, ওটা নাকি একটা বাঘের আস্তানা। আমরা ওকথা বিশ্বাস করিনি।

রাজামিয়া বলল, আশ্চর্য সাহস তো!

সাহস নয়, বুদ্ধি।

সেটা কী রকম ?

গুণমালাকে তো দেখলেন সেদিন ; ওদের একটা কুকুর ছিল। কুকুরটা সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম। রাণু হাসতে থাকল। আগে কুকুরটাকে রেখে আমরা ঢুকলাম। বাঘ থাকলে সে কিছুতেই ত্রিসীমানায় ঘেঁষবে না।

দারুণ, দারুণ! তারপর ?

তারপর আর কী ? হৈচৈ করে পিকনিক করা হল। একটা শেয়ালও ছিল না।

গম্বুজওয়ালা ঘরটার চারদিকে ধ্বংসস্তূপ। ঘন জঙ্গল গজিয়ে আছে। সরু একফালি রাস্তার মতো ফাঁকা লম্বাটে জায়গা। রাণু বলল, এটাকে কেউ বলে মসজিদ, কেউ বলে ফাঁসিঘর—কিংবা জহ্লাদখানা। মুর্শিদকুলিখাঁর আমলে নাকি তৈরি।

রাজামিয়া একটু ঝুঁকে সুঁড়িপথটা দিয়ে আগে ঢুকে গেল উঁচু খালামেলা উঠোনে। কালো বেলে পাথরের টালিগুলো কোথাও কোথাও উপড়ে নিয়ে গেছে লোকে। সেখানে কাশ গজিয়েছে। শাটল ধরা গম্বুজঘরটাই শুধু টিঁকে আছে কোনোরকমে। গম্বুজের শাটলেও গাছ আর শ্যাওলার ছোপ।

রাণুর সুঁড়িপথে ঢুকেই চুলে টান পড়েছিল। কাঁটালতার ঝাড় আঙুল ঢুকিয়ে দিয়েছে চুলে। টানাটানি করছে দেখে রাজামিয়া গিয়ে ওকে মুক্ত করল। ভেতরে ঢুকে রাণু বলল, বলুন তো এখানে কী হত ? আমার ধারণা···

রাজামিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে সে চোখ নামাল। রাজামিয়া তার দিকে তাকিয়ে আছে। আস্তে বলল, লাভারদের জন্য আইডিয়াল প্লেস, রাণু। হায়, যদি আমরা লাভারস হতাম।

রাণু কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, ওসব কী কথা ?

ওর কাঁধে হাত রেখে রাজামিয়া প্রেমিকের গলায় বলল, এখা৻ আমাকে কেন আনলে রাণু ?

রাণু শব্দ করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে একটু সরে দাঁড়াল। গল ভেতর বলল, ওসব কথা ভাবলেন কেন? আমি এসব কিছু ভাবিনি।

রাজামিয়া মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, আত্মপ্রতারণা করলে আর দুঃখ পাবে রাণু।

• রাণু থর থর করে কেঁপে উঠল। আস্তে বলল, চলুন, ফেরা যাক দেরি হয়ে গেছে।

হুঁ ফেরা যাক। বলে রাজামিয়া আকাশের দিকে তাকি৻ রইল মুখ তুলে। আকাশ নীলরঙে ধোওয়া। একটা পিঁপড়ে৻ মতো কিছু উত্তর থেকে দক্ষিণে নেমে যাচ্ছিল সেই বিস্তৃত নীলে৻ গা বেয়ে—শব্দ শোনা যাচ্ছিল না, প্লেন ছাড়া আর কিছু নয়। সেটা নিখোঁজ হয়ে গেলে রাজামিয়া মুখ নামাল। দেখল, রাণু অন্যদিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে আছে। নিঃশ্বাস ছেড়ে রাজামিয়া ঘড়ি দেখল। তারপর বলল, সাড়ে দশটায় আমার ট্রেন।

রাণু কোনো কথা বলল না। তার শরীর কাঁপছিল। প্রা৻ একটা ঘুর্ণিঝড় এইমাত্র চলে গেল তার ওপর দিয়ে। দূরে এখ৻ সেই শব্দ অপস্রিয়মান। এখানে ওখানে ছেঁড়া সবুজ পাতার ম৻ কত কী ইচ্ছে যেন ছড়িয়ে পড়ে রইল।

রাজামিয়া বাইরে চলে গেছে, তখনও রাণু দাঁড়িয়ে আছে৻ বাইরে থেকে রাজামিয়ার ডাক এল, রাণু, কী করছ ?

রাণু নড়ে উঠল। সন্থ স্বপ্ন থেকে জাগার মতো আচ্ছন্নতায় ৻ পা বাড়াল। প্রতি মুহূর্তে চমকে উঠছিল সে। তাই তো! এতক্ষ৻ কী করছিল—কোথায় ছিল সে? কেন অমন বোধশূন্য হ৻ গিয়েছিল? একটা কিছু ঘটে যেতে পারত বড় সহজেই। ঘটেনি— বড্ড বেঁচে গেছে। কিন্তু বুকের ভেতর একটা চাপা কান্না ঠে৻

ঠছে। কিন্তু ঘটতে যাচ্ছিল বলে নয়, কী যেন হারিয়ে গেল—পেতে গিয়ে পেল না। এতকাল পরে জীবনে এই যে সময়টা অতর্কিতে এসে পড়েছিল, তাই কি প্রেম? রাণু মুখ নামিয়ে হাঁটছিল। নির্জনে এক পুরুষ এক নারীকে নিয়ে দুর্বোধ্য কী খেলা খেলতে চায়—তাই কি প্রেম? রাণু জানে না। অথচ খালি মনে হয়, একটা অসম্পূর্ণ খেলার দুঃখ নিয়ে তাতে চিরকাল কাটাতে হবে।

একটু পরে একটা আমবাগানের ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে রাজামিয়া বলল, আমি মুসাফির মানুষ। আর হয়তো তোমার সঙ্গে কোনোদিন দেখা হবে না। কাজেই এই তুচ্ছ ঘটনাটা ভুলে যাওয়া খুব ইজি হবে। তবু মাফ চাইছি রাণু। আমি তোমায় বুঝতে ভুল করেছিলাম।

রাণু বলতে পারত, হয়তো ভুল করোনি—পারল না। চুপ করে রইল।...

সাত

নাজিমের ইচ্ছে ছিল, আজ ছুটি নেবে। জগন্নাথ তাকে খুঁজে বের করেছিল বাসস্ট্যানডের কাছে হাজরার 'রেস্তোরাঁ' থেকে। সাধাসাধি করে কান্দি নিয়ে গিয়েছিল। ট্রাকভর্তি খন্দের বস্তা নিয়ে তিরিশ মাইল পাড়ি। নাজিম ঢুলছে দেখে অকুতোভয়ে জগন্নাথই শেষ পর্যন্ত ড্রাইভ করেছে। কিন্তু তার লাইসেনস নেই। কান্দি ঢাকার আগে ঘুম থেকে উঠিয়েছিল নাজিমকে।

ফিরতে বেলা গড়িয়ে গেছে। নাজিম তখন চাঙ্গা। পীরতলায় এসে ব্রেক কষে বলল, গুরু, আজ আর নাজু যাচ্ছে না। আজ রাতটা ওস্তাদের বাড়ি জেয়াকত (নেমন্তন্ন) খাব। ফুর্তি করব। তুমি এটুকু পথ চালিয়ে নিয়ে যাও। গাড়ি তো খালি।

জগন্নাথ চোখ কপালে তুলল, এই নাজুদা! কেলেংকারি হবে পাকিকে ধরলে।

কিচ্ছু হবে না বাবা। গিয়ে মামাকে বলো, নাজিম পটা
তুলেছে। কবর দিয়ে এলাম।...বলে নাজিম লাফ দিয়ে নামল।

অগত্যা জগন্নাথ স্টিয়ারিঙে বসল। স্টারট দিয়ে মিটিমিটি হেসে
বলল, জুয়াড়ীর বাড়িতে প্রাণটা মাইরি কবে খোয়াবে নাজুদা
সত্যি সত্যি না পীরতলায় কবরে ঢোকায় দেখো!

আবে যা! নাজুকে ডর দেখাসনে।...নাজিম হাসতে হাসতে
হাত তুলে টা টা করে দিল। জগন্নাথ ট্রাক নিয়ে চলে গেল।

নাজিম বাঁশবন পেরিয়ে গিয়ে বাড়িটার দিকে তাকাল
গাবতলায় কেউ নেই। নাজিম ডাকল, ওস্তাদ আছ নাকি? ও
ওস্তাদ!

সাড়া এল, কে বে?

নাজিম বুঝল, কাশেম নেশায় আছে। উঠোনে শতরঞ্জি পেতে
আসন করে বসেছে। সামনে একটা তাড়ির হাঁড়ি। মুখে ন্যাকড়ার
ছাঁকনি আঁটা। কাচের গেলাস অর্ধেকটা ভর্তি। একটা থালায়
নুন পেঁয়াজ লংকা মাখানো চাল-কলাই ভাজার চাট। নাজিম ঘরের
দিকে তাকাল। মুন্নী দরজার মুখে দাঁড়িয়ে কিল দেখাল।

কাশেম বলল, আয়, তোকে জবাই করি বে! মুন্নী, চাকু দে।

নাজিম হাসতে হাসতে পাশে বসে বলল, এই তো এলাম আজ
জেয়াকত খেতে। আমাকে কেটে আমাকেই খাওয়াবে চাচা?

কাশেম ওর কাঁধে এক হাত রেখে অন্যহাতে গোঁফের তাড়ির রস
মুছে বলল, মুন্নীবেটি, জলদি একটা গেলাস দে। নকশাকাটা
গেলাস দিবি। মিয়ার বেটার খাতির করি।

মুন্নী বাঁকামুখে বলল, গেলাস নেই। ভেঙে গেছে।

কাশেম চোখ নাচিয়ে বলল, হারামজাদির বড্ড হুঁশ। খান-
বাহাদুরের নাতির ধম্ম নষ্ট হতে দেবে না।

মুন্নী উঠোন পেরিয়ে গিয়ে গঙ্গার ধারে দাঁড়াল। ঢালু হয়ে
জমিটা নেমে গেছে। ঝোপঝাড়ে ঢাকা। নাজিম তাকে দেখে
নিয়ে বলল, খবর পাওনি চাচা? কুতুবগঞ্জে জব্বর শো হয়ে

গেল। অনেক ছক পড়েছিল। পরপর তুরাত। গেলে ভাল করতে!

শুনেছি বাপ। রাজা হরবোলা এসেছিল শুনেছি। শালা 'ফোরটোয়েনটি'। চোট্টা কাঁহেকা।

নাজিম অবাক হয়ে বলল, ও চাচা! কী বলছ যাতা?

কাশেম ওর উরুতে থাপ্পড় মেরে বলল, বলি শোন বাপ। ও একটা ফোরটোয়েনটি। এক নমবরের বাটপাড়।

কে?

ওই রাজা শালা।

নাজিম হাসল।···আজকাল এক গেলাসেই কাত হয়ে যাও ওস্তাদ!

ও রে না। কাশেম জড়ানো গলায় বলল। আমার নেশা হয়নি। খোদার কসম। ওই ছোকরাকে আমি এট্টুকুন থেকে চিনি। গুয়োর ডিম ভাঙেনি তখন থেকে। হুঁ, বড় ঘরের ছেলে বটে। তোদের মতই মিয়ামোখাদিম বংশ। সালারে আয়মাদারি সম্পত্তি ছিল ওদের। সব বেচে খেয়েছিল ওর বাপ। বারোখানা নিকে করেছিল, জানিস?

বলো কী?

সালার গিয়ে খোঁজ নে না! সত্যি না মিথ্যে জানতে পারবি। কাশেম গেলাস খালি করে বলল, ও মুন্নী! গেলাস দিলি নে বেটি? বস বাপ আমি নিয়ে আসি।

সে টলতে টলতে উঠল। পা বাড়াতে গিয়ে ঘুরে ফের বলল, রাজা হরবোলা বাপের লাইনে ঘোরে। বুঝলি? যেখানে যায়, লোকের সঙ্গে ভাব করে। তেমন মেয়ে দেখলে বাগায়—হুঁ, সে হিম্মত ওর আছে। ওর মাগের সংখ্যা নেই। কতবার পুলিশের পাল্লায় পড়েছে। শুনেছি, জেলও খেটেছে! লোকের হাতেও মার খেয়েছে। বলব তোকে, সব বলব। ওর 'হিসটি' আমার মুখস্ত।

কাশেম ঘরে ঢুকে গেলাস খুঁজতে থাকল। নাজিম গুম হয়ে

গেছে। রাজামিয়াকে তার এত ভাল লেগেছে, তাছাড়া সে মহা শিক্ষিত লোক—সেটা তার ইংরেজি বলাতেই টের পাওয়া যায়, তাকে বাটপাড় বলছে কাশেম জুয়াড়ী? এমন কী, নাজিমের মাথায় রাণু আপার সঙ্গে রাজামিয়ার বিয়ে দেওয়ার কথাটাও মাঝে মাঝে উড়ে এসে ভনভন করছিল। কান্দিতে আজ দুপুরে আনন্দবাবুর আড়তে বসে থাকার সময় ঠিক করে ফেলেছে নাজিম, রাণু আপার বিয়েটা হয়ে না গেলে মুন্নীকে সে বিয়ে করবে না। এটা কেমন যেন দেখায়। বাড়িতে অমন একটা বোন এখনও স্বামীর মুখ দেখতে পেল না, ওদিকে ছোট বোনের বিয়ে হয়ে গেল। ধুস্ শালা। নাজিমের মতো ভাই থাকতে এটা কেমন যেন হল? রাজামিয়া তাই তার সামনে জ্বলজ্বল করে উঠেছিল। আর, রাণু আপাও আপত্তি করত বলে মনে হয় না। আলাপ করিয়ে দেবার পর দুদিন ধরে রাণু রাজামিয়ার যত্নআত্তি করছে। নিঃসংকোচে গল্প-সল্প করছে। গতরাত্রে রাজামিয়ার শো দেখতে যাবার কথা ছিল। নিশ্চয় গিয়েছিল। নাজিম অন্তত এটুকু আঁচ করতে পেরেছে যে রাজামিয়াকে রাণু পছন্দ করেছে।

কিন্তু এ আবার কী উল্টোপাল্টা করে ফেলল কাশেম জুয়াড়ী! নাজিম বিশ্বাস করতে পারছে না। অথচ কাশেম জুয়াড়ী খামোকা একটা লোককে বদনাম দেবেই বা কেন? দোটানায় পড়ে নাজিমের মনটা ভেতো হয়ে গেল।

গেলাস হাতে টলতে টলতে কাশেম বেরিয়ে বলল, হুঁ, কী বলছিলাম যেন? রাজা হরবোলা! রাজাই বটে, বুঝলি বাপ নাজুমিয়া? বাটপাড়ের রাজা! উরেব্বাস! হারামী আমার কলজেয় পর্যন্ত হাত ঢুকিয়েছিল!

নাজিম ফুঁসে উঠল।···কী খালি লোকের নামে বদনাম দাও চাচা? রাজামিয়া আমার মেহমান এখন। আমিই তাকে সেই ধুলিয়ান থেকে সেধে এনেছি। মেহমানের নামে বাজে কথা বললে মাইরি আমার খুব দুঃখ হবে!

কাশেম খিলখিল করে হাসতে হাসতে বসল। গেলাসটা নাজিমের সামনে রেখে তাড়ি ঢালতে থাকল। ছলকে পড়ে গেল খানিক। জিভ কেটে সে বলল, চেটে নাও মাণিক! অনেক দুঃখের ফসল। হারামী মোতি বেশি পয়সার লোভে দরগাতলায় গিয়ে বসে থাকে।

নাজিম ঢকঢক করে তাড়িটা গিলে গেলাস রাখল। বলল, গাড়ি সঙ্গে থাকলে তুমাকে শালা এক্ষুনি নিয়ে তুলতাম কুতুবগঞ্জে। সামনাসামনি ভজিয়ে ছাড়তাম। আড়ালে মিনিস্টারকেও শালা বলতে পারে লোকে।

কাশেম বলল, আমাকে দেখলেই তোমার দোস্ত ভাগত, সোনা!

কেন? ভাগত কেন?

বক্রেশ্বরের মেলায় তিন বছর আগে আমার কাছে, বুঝেছ, তিরিশটে টাকা এক্ষুনি দিচ্ছি বলে ধার নিলে। তারপর হওয়া! কাশেম ঘুরে মুন্নীকে খুঁজতে লাগল।···কই, আমার বেটি কই? অ মুন্নী, সাক্ষী দিবি আয়!

মুন্নী উঠোনের বাইরে যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেখান থেকেই বাঁকা মুখে বলল, কী?

আয় তো বেটি এখানে।

মুন্নী ঝাঁঝাল স্বরে বলল, আগে চিৎপাত হয়ে পড়ো, কুকুর এসে মুখ চাটুক—তারপর যাব।

কাশেম চাপাগলায় বলল, চটেছে। আজকাল হারাম খাওয়া সইতে পারে না।

নাজিম বলল, হারাম জানো যদি, গেলো কেন?

সকাল সকাল শুয়ে পড়েছিল রাণু। শরীর খারাপ বলে খায়নি। বালিশে গাল রেখে কাত হয়ে শুয়েছিল। ঘরে অন্ধকার। বাইরে বাতাসের হুলুস্থুল। গাছপালা শনশন করছে। পুকুরের দিকে বাঁশবনে ভূতুড়ে কান্নার মতো অদ্ভুত সব শব্দ। আর বুকের ভেতর

থেকে সেই চাপা কান্নাটা এখন বর্ষার গঙ্গার মতো কলকল করে বয়ে যাচ্ছে। চুপিচুপি কাঁদছিল সে।

উঠোনে হেরিকেনের দম কমিয়ে পায়ের কাছে রেখে মোড়ায় বসে আছেন মবিনকাজি। রাতের নমাজ পড়ে এসেছেন মসজিদ থেকে। বুলির বিয়ের কথা পাকা হলে ঠিক এমনি করে মসজিদে যাওয়া বেড়েছিল। রাণুর বিয়েটা হয়ে গেলে আবার এটা কমে যাবে।

কাজিসায়েবের মাথায় নমাজ পড়া টুপিটা এখনও আছে। বলছিলেন, বুলিরা খবর পেতে পেতে বিয়েটা হয়ে যাবে। কী আর করা? তবে একটা ব্যাপার তুমি লক্ষ্য করেছ? আমার তুই বেটির ওপরই খোদার নেকনজর আছে। বুলির বেলাতে এমনি জলদি দিন ঠিক হয়েছিল। রাণুর বেলাতেও তাই হল। হাতে আর মোটে সাতটা দিন। ঝামেলা একটু হবে। তা হোক। নাজু সব সামলাবে। বোনদের ব্যাপারে নাজুর উৎসাহ কেমন, বুলির বিয়েতে তো দেখেছ, যত দোষই থাক ওর।

জোহরা বললেন, তাও ভাল।

কী?

ওই যে—নাজুর গুণটা চোখে পড়েছে!

কাজিসায়েব হাসলেন।···সদ্বংশের রক্ত গায়ে আছে। সবটুকুনই তো খারাপ হবে না। এ বয়সে একটু বেচালে সবাই চলে।

জোহরা শক্ত গলায় বললেন, নাজু বাড়ি ফিরছে না যে! ফিরলেই হারামী চাঁদু জমাদারকে পয়জার খাইয়ে ছাড়ব। ছোট-লোকের বড্ড বাড় বেড়েছে আজকাল। হক-না-হক বদনাম রটাচ্ছে আমার বেটার নামে!

কাজিসায়েব একটু কেশে বললেন, রাণু এরি মধ্যে শুয়ে পড়ল নাকি?

হুঁ। জোহরা তেতো হয়ে বললেন। কী হয়েছে তোমার বেটির, সে-ই জানে। তুপুরে ভাল করে খেলে না। রাতে তো

মুখেও দিলে না কিছু। বললে, শরীর খারাপ। মুখখানা হাঁড়িপানা হয়ে আছে।

কাজিয়া করেছ তাহলে। মবিনকাজি অনুযোগ করলেন।

জোহরা চটে গিয়ে বললেন, আমি খালি কাজিয়াই করি! মাথা-খারাপ করে দিওনা রাতদুপুরে।

কাজিসায়েব ব্যস্তভাবে বললেন, আহা! কথার কথা বলছি।

জোহরা আস্তে বললেন, ময়নার মা তখন ঠাট্টা করে কী যেন বলছিল রাণুকে। রাণু বললে, ছুর। মাথায় টাক। তখন বুঝতে পারিনি, পরে খেয়াল হল।

টাক?

দামাঁদ মিয়ার মাথায় টাক আছে না?

কাজিসায়েব খিকখিক করে হাসতে লাগলেন।···ওটা একটা কথা হল? হুঁঃ, টাক!

জোহরা বললেন, রাণুর মতিগতি আমার ভালো ঠেকছে না জানো?

কেন, কেন?

অত আমি জানি না! জোহরা হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। নিঁদ পাচ্ছে। শুই গে।

কাজিসাহেব বসে রইলেন। একটু পরে টুপিটা মাথা থেকে খুলে ভাঁজ করে পানজাবির পাশপকেটে ঢোকালেন। তারপর স্ত্রীর উদ্দেশে বললেন, শুভকাজটা চুকে যাক। তোমাকে তো শাহাবুদ্দিন নিয়ে গিয়ে রাখবে বলেছে। আমি চলে যাব ঢাকায়। শেষ কয়েকটা দিন ভাইদের কাছে থাকব। আমার আবার ভাবনা? তখন নাজু একা ভিটে আগলাক।···

সবাই কোথাও যেতে চায়। যে যেখানে থাকে, সেখানটা তার মনের মতো নয়। রাণু কান করে শুনছিল বাবা-মায়ের কথা। ভাবছিল, তার নিজেরও তো একই সাধ—কোথাও চলে যেতে পারলে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। এই জীবন বড় একঘেয়ে। দিনের পর দিন একই জীবনযাপনের ধারা। আর ক'দিন পরে স্কুল খুলে

যাবে। আবার সেই সারাটা দিন একনাগাড়ে বকবকানি। জ্ঞান বিতরণ। মাথার খুলির ভেতর সারবস্তুটা দিনে দিনে ক্ষয়ে যেতে থাকে। অথচ দুনিয়ার কোনো হের-ফের ঘটে না। তবু তো বুলি যতদিন ছিল, ততদিন কোনরকমে কেটেছে। বুলি চলে গেলে শুধু বাড়ি নয়, রাণুর মনটাও খাঁ খাঁ করেছে। বিকেল এলেই বুলি ছিল তার ছুটির সময়ের খেলার মাঠ। বুলি রাণুকে চঞ্চল করত। বুলির বুড়ি ছুঁয়ে রাণু কানামাছি খেলত আপন মনে। ওর খালি জায়গা কে ভরে দিতে পারে? গুণমালা এসেছে চলে যাবে। মেলামেশার মতো আর যারা আছে, তারা তার ছাত্রী। রাণুর সমবয়সী মেয়েরা কে কোথায় চলে গেলে একে একে। শুধু রাণুর যাওয়া হল না। কোথেকে ইসলামপুরের এক টাকওয়ালা ভদ্রলোক এসে বলে গেল, রাণু বেগম এখানেই থাকবেন। যা করছেন, তাই করবেন। এবং উনি মাঝে মাঝে এসে রাণুকে সঙ্গ দেবেন। তার মানে রাণুর পাশে এসে শোবেন। ছেলেপুলের জন্ম দেবেন। বাঃ! কী দারুণ প্রস্তাব!

রাণু ঠোঁট কামড়ে ধরল। রাগে দুঃখে চোখে জল এসে গেল। বালিশের কোণা আঁকড়ে ধরে সে নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করল। দুনিয়ার স্বার্থপর ও নিষ্ঠুর চেহারাটা বেরিয়ে পড়েছে চোখের সামনে। চোখের ঠুলিটা কেউ কিছুক্ষণ আজ খুলে নিয়েছিল। রাণু খোলা চোখে তাকিয়ে দেখেছে, হঠকারী উপদ্রবের মতো একটা সকাল আজ তাকে অন্য কোথাও নিয়ে যেতে চাইছিল। রাণুই যেতে পারল না। তার ভয় করছিল। কোনো পুরুষের সঙ্গে এভাবে নির্জনে সে মেশার সুযোগ পায়নি। ভালবাসার ডাক কানে শোনেনি কোনোদিন। মুসলিম মেয়ে হয়ে জন্মেছে বলে বড় সীমাবদ্ধতায় আটকে থেকেছে রাণু। সেই সীমা অবচেতন বিদ্রোহে ডিঙিয়ে কিছুদূর এগিয়েছিল। তারপর ভয় পেয়ে পালিয়ে এল।

কিন্তু প্রেম-ভালবাসা কি অমন করেই আসে? রাণু জানে না। গুণমালার সঙ্গে মোয়াজ্জেমের যে প্রেম-ভালবাসা ছিল, তাও কি হঠাৎ কোনো এক মুহূর্তে বিস্ফোরণের মতো আত্মপ্রকাশ করেছিল?

গুণমালা বলেনি। নিজের জীবনের সেই হঠকারী, অথচ প্রত্যাশিত মুহূর্তটির কথা গুছিয়ে বলাও তো ভারি কঠিন।

রাজামিয়ার অমন করে চলে যাওয়ার কথা ছিল না। অন্তত নাজিম যতক্ষণ না ফেরে, তার থাকার কথা! জোহরা বলেছিলেন, দুপুরে খেয়ে যাবে—তাড়া কীসের? নাজু বাড়ি ফিরুক। এসে যদি না দেখে, ভাববে আমরা ওর মেহমানের খাতির করিনি। তাড়িয়ে দিয়েছি। হুলুস্থুল বাধাবে নাজু। ও রাণু, ওনাকে বল। রাণু রাগ দেখিয়ে বলেছিল, তুমি গিয়ে সাধো না!

জোহরা পাল্টা রেগে বলেছিলেন, কথা শোনো। আমি ওনার সামনে যাব?

রাণু নিঃশব্দে নিজের ঘরে ঢুকেছিল। জানলা দিয়ে দেখেছিল, পিঠে হ্যাভারস্যাক, হাতে একটা স্যুটকেস নিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে রাজামিয়া দেউড়িতে গেল। একটু দাঁড়াল। কাঠমল্লিকা গাছটার দিকে মুখ তুলে তাকাল। তারপর হঠাৎ কয়েকবার ঘুঘু পাখির ডাক ডাকল।

তারপর চলে গেল গাছপালার আড়ালে। কতক্ষণ ধরে ঘুঘু পাখির ডাকটা শোনা যাচ্ছিল! কিন্তু রাণু হাসতে পারছিল না। ঘুঘু ডাকটা তার মাথার ভেতর ঢুকে গেছে। অসহ্য লাগছে। স্থির দাঁড়িয়ে রাণু ঠোঁট কামড়ে ধরে নির্জন দেউড়ির দিকে তাকিয়ে ছিল কতক্ষণ।

সারাদিন যতবার কোথাও ঘুঘু পাখির ডাক শুনেছে, রাণু চমকে উঠেছে—রাজামিয়া নাকি? নাজুর সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল হয়তো কোথাও। নাজু তাকে টেনে নিয়ে আসছে।

নাঃ, সত্যিকার ঘুঘু পাখি। কিন্তু কেউ জানবে না, ঘুঘু পাখির ঘুমঘুম ওই ডাকের একটা আলাদা মানে রাণুর জীবনে থেকে গেল।

অন্ধকার ঘরে কখন রাণুর চোখের পাতা ঘুমে জড়িয়ে এসেছিল। সেই সময় চাপা গলায় কে ডাকল। ঘুমটা কেটে গেল সঙ্গে সঙ্গে। বলল, কে?

জানলার বাইরে কালো হয়ে দাঁড়িয়ে নাজিম বলল, আমি, দরজাটা খুলে দে না আপা।

কোনো-কোনো রাতে নাজিম এসে এমনি করে ডাকে। রাণু জানে, সেদিন নাজিম নেশা করে আসে। আব্বা তো উঠবেন না দরজা খুলতে। মা ওঠেন। দলিজ ঘরের দরজা খুলে দেন। কিন্তু নেশা করে এলে রাণুকেই ওঠায় নাজিম। চুপিচুপি ডাকে। খিদে থাকলে রাণুকেই খেতে দিতে হয়। ঘর থেকে জোহরা টের পেয়ে শুধু বলেন, নাজু এলি নাকি ?

রাণু অন্ধকারে দরজা খুলে বেরুল। ভেতরের বারান্দায় থামের কাছে লণ্ঠনটা নিবুনিবু হয়ে সারারাত জ্বলে। দম বাড়িয়ে দলিজ-ঘরে গিয়ে সে দরজা খুলে দিল। নাজিম ঘরে ঢুকেই তক্তপোশটা দেখে নিয়ে বলল, রাজাশালা ভেগেছে দেখছি। জোর বেঁচেছে! তারপর দরজা নিজেই আটকে দিয়ে বলল, খুব গন্ধ পাচ্ছিস কি ?

রাণু না পেলেও নাকটা আঁচলে ঢেকে বলল, পাচ্ছি। নিজে হাতে খেয়ে নে গে। আমার ঘুম পাচ্ছে খুব।

নাজিম একটু হাসল।...এক জায়গায় মুরগি আর পরোটা টেনে এলাম। আসতে দিচ্ছিল না, চলে এলাম। মান্নাবাবুর ট্রাক পেয়ে গেলাম পথে। নইলে আট মাইল হাঁটতে হত। কিন্তু ধুস। যার জন্যে এত কষ্ট করে এলাম সে শালাই নেই। হুঁ, একটা কিছু আঁচ করে কেটে পড়েছে শালা চারশো বিশ!

রাণু ভুরু কুঁচকে বলল, মাতলামি করলে আব্বাকে ডাকব।

নাজিম জিভ কেটে বলল, চুপ। ইমপর্ট্যান্ট বাতচিৎ আছে তোর সঙ্গে।

রাণু বারান্দায় লণ্ঠনটা রেখে চলে এল নিজের ঘরে। নাজিম পেছন পেছন এসে বলল, আপা শোন। রাজাশালা কখন ভাগল বল তো ?

শালা-শালা করছিস কেন ? রাণু দরজার কপাট টানতে টানতে বলল। তোরই তো গেস্ট।

নাজিম ওকে ঠেলে ভেতরে ঢুকে গেল। বাইরের লণ্ঠনের আলো লম্বা হয়ে ঘরে ঢুকেছে। টেবিলের ওপর একপা তুলে একপা ঝুলিয়ে নাজিম বসল। রাণুর মনে হল, আজ তত বেশি নেশা করে আসেনি নাজিম। মুখটা কী রাগে যেন জ্বলছে। ওর শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। রাণু ফের বলল, কী ব্যাপার রে?

নাজিম চাপা স্বরে বলল, হারামী শ্রীচারশো বিশ গেল কখন বল তো?

রাণু অবাক হয়ে তাকাল ওর দিকে।·· সাড়ে দশটার ডাউনে গেছেন। কিন্তু ভদ্রলোককে তুই গাল দিচ্ছিস কেন?

ভদ্রলোক? ও শালা আবার ভদ্রলোক! নাজিম বিকৃত মুখে ফিসফিস করে বলল। ইস, আগে যদি জানতাম! আর অবাক লাগছে, মেয়েটাও মাইরি আমাকে বলল না কিছু! অথচ সব জানে!

রাণু ঝাঁঝাল গলায় বলল, কী বলছিস আবোল তাবোল নেশার ঘোরে? শোগে যা। আমার ঘুম পাচ্ছে।

নাজিম বলল, তোকে কিছু লুকাবো না আপা। তুই আমাব গার্জেন। তোকে কত মানি, তুইতো জানিস। আমি পীরতলার কাশেমের মেয়েকে বিয়ে করব। পাকা কথা হয়ে গেল। চল্লিশটে দিন 'ইদ্দত' পালতে হবে মেয়েটাকে। সদ্য তালাক হয়েছে কি না! নাজিম হাসল। ভেবে দেখলাম, আমার ততবেশি বিদ্যে নেই— ড্রাইভারি করে খাই। আমার মতো ছেলের জন্যে ওই যথেষ্ট। মেয়েটার একটু বেচাল অবশ্যি আছে। তা এই নাজুর পাল্লায় পড়লে চালে এসে যাবে, তুই ভাবিসনে। শালা জাত নিয়ে ধুয়ে খাব? পাঠান বংশ! পাঠান গায়ে লেখা থাকে না। কী বলিস?

রাণু অগত্যা হাসল। · যা খুশি কর। কিন্তু রাজামিয়াকে গাল দিচ্ছিস কেন?

ওর হিসট্রি শুনে এলাম। নাজিমের মুখ আবার বিকৃত হয়ে

গেল। সামনে পেলে পেঁদিয়ে লাট করতাম শালাকে। জোর বেঁচে গেছে।

কেন রে? রাণু আস্তে প্রশ্ন করল।

জানিস হারামীটা যেখানে যায়, পটিয়ে-পাটিয়ে লোককে ভুজুং-ভাজুং দিয়ে বিয়ে করে। জামাই হয়ে কিছুদিন ফুর্তি ওড়ায়। তারপর টাকাকড়ি গয়না-গাঁটি বাগিয়ে রাতারাতি ভেগে যায়। এক এলাকায় শুয়োরের বাচ্চা দুবার যায় না। এমনি করে কত লোকের সর্বনাশ করেছে, বলার নয়।

নাজিম সিগারেট বের করে ধরাল। রাণু শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, কে বলল তোকে?

পীরতলার কাশেম খাঁ।

সেই জুয়াড়ী লোকটা?

জুয়া ছেড়ে দিয়েছে। নাজিম হাসল ফের। তাছাড়া হুঁশ করে কথা বল, সে আমার হবু শ্বশুর।

তার কথা তুই বিশ্বাস করলি?

নাজিম চটে গেল।···শালা লম্পট মুন্নীর হাত ধরে টেনেছিল জানিস? ওর বাবাকে পটাতে চেয়েছিল বিয়ে করবে বলে, জানিস? মুন্নীটা যে বড্ড ভাল মনের মেয়ে। ওর মনে কোনো কুটো পড়ে থাকে না।

রাণু বলল, শো গে যা। আমাকে এসব কথা বলে লাভ কী?

নাজিম টেবিল থেকে নেমে বলল, তোর সঙ্গে মাখামাখি করতে চাইছিল না? তোকে ফাঁদে ফেলার মতলব নিশ্চয় ছিল। বুঝলি আপা? চোর পালিয়ে গেলে গেরস্থের বুদ্ধি বাড়ে। ভাবলাম, তোর জানা দরকার।

নাজিম বেরিয়ে গেলে রাণু কপাট বন্ধ করতে করতে বলল, আমার জানার কোনো দরকার নেই—কে কেমন, কে কী করেছে।

কিন্তু রাণু টের পাচ্ছে, বাকি রাত আজ আর তার চোখে ঘুম আসবে না।···

আট

শুক্রবার ইসলামপুর থেকে রাণুর বিয়ের লগন আসার কথা। আগের রাতে ময়নার মা শেখপাড়া থেকে কয়েকটি গাওনী-নাচুনী মেয়ে জুটিয়ে এনে কাজি বাড়ির উঠোনে ঢোল বাজিয়ে অনেক রাত অব্দি তুলকালাম করেছে। রাণুর মুখে বড় সাধে একদলা হলুদবাটা মাখাতে গিয়েছিল বুড়ি। রাণু ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করেছিল। আর বেরোয় নি। সোমবার বিয়ে। কদিন আগে থেকেই এসব হইচই চলতে থাকে।

লগন আসবে দুপুর নাগাদ। একজন 'কোটাল' তা বয়ে আনবে। সঙ্গে আসবে বরের বাড়ির কোনো লোক। জোহরা ঠাট্টা করে বলেছিলেন স্বামীকে, চাষীবাড়ির লগন তো! দেখবে একগাদা গুড়ের পাটালি আর পুকুরের মাছ পাঠাবে। গায়ে হলুদের শাড়ি কেমন আসবে, সেও বলতে পারি।

কাজিসায়েব জিভ কেটে বলেছিলেন, চুপ, চুপ। ওসব কথা তুলো না। যা পাঠায়, পাঠাক না।

নাজিমকে থাকতে বলেছেন জোহরা। লগন আসার দিন বাড়ির ছেলে বাড়িতে না থাকলে চলে না। নাজিম আছে। বহরমপুরের যে মুসলিম ক্যাটারার বুলির বিয়েতে খাওয়াতে এসেছিল, তাকে বায়না করে এসেছে সে। ডেকরেটার কুতুবগঞ্জেই আছে। দেউড়িতে নহবতখানা বানাবে। বাড়ির সামনের চত্বর জুড়ে মণ্ডপ হবে। নাজিমের মাথায় অনেক প্ল্যান। বড়বোনের বিয়ের জৌলুস বড় রকমেরই হওয়া দরকার। দুদিন ধরে মাইক বাজিয়ে শালাদের কানে তালা ধরিয়ে দেবে নাজিম।

লগন-দাররা লগন এনে মসজিদে জুম্মার নমাজ পড়বে। কাজি-সায়েব অস্থির। কোথায় কোথায় যাচ্ছেন, আর ফিরে এসে ব্যস্তভাবে জিগ্যেস করছেন, আসেনি ওনারা?

জোহরা শান্তভাবে বলেছেন, আসবে'খন। কাছের পথ নাকি?

বুলির লগন ভোরবেলা এসেছিল। কলকাতা থেকে ট্রেনে এসে-ছিল। ইসলামপুর থেকে বাসে আসবে লগন। তাড়া দিয়ে নাজিমকে বাসস্ট্যানডে পাঠানো হয়েছে। নাজিম সেখানে আড্ডা দিচ্ছে আর বাসের দিকে নজর রেখেছে।

মসজিদে আজান হল জুম্মার। কোথায় লগন? বাস ফেল করেছে নাকি? কাজিসায়েব মসজিদে চলে গেলেন। একটু পরে নাজিম ফিরে এসে বলল, তুটো বাস দেখলাম। আবার বাস সেই বিকেল চারটেয়। বাস ফেল করেছে। নাজিম হাসতে লাগল।

কিন্তু বিকেল গড়িয়ে যাচ্ছে, নাজিম আবার বাসস্ট্যানডে গেছে, লগনের খবর নেই। নাজিম ধুস শালা বলে ওহিদের হোটেলে কাবাব কিনতে ঢুকল। সন্ধ্যায় মোয়াজ্জেমের সঙ্গে তাড়ির আসরে বসার কল আছে।

দলিজের বারান্দার জীর্ণ ইজিচেয়ারে নতুন রঙীন তোয়ালে ঢেকে বসেছিলেন মবিনকাজি। চোখ দেউড়ির দিকে। চোখের তলার ছোপটা গাঢ় হয়েছে। কপালের রেখাগুলো গভীর দেখাচ্ছে। বাড়ির ভেতর জোহরা আপন রীতিতে চা গিলছেন। ময়নার মা চুপ করে বসে আছে পা ছড়িয়ে। গিন্নিবিবির সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছিল। ধমক খেয়ে মুখ গোমড়া করেছে।

রাণু বেরিয়ে গেল। জোহরা মুখ তুললেন। কিন্তু কিছু বললেন না।

রাণু বাইরে গেলে কাজিসায়েব ডাকলেন, বেরুচ্ছ কোথা এ অবেলায়? অ রাণু!

রাণু আস্তে বলল, বড়দি দারজিলিং চলে যাবেন সন্ধ্যায়। ট্রেনে তুলে দিয়ে আসি।

কাজিসায়েব চুপ করে থাকলেন। মাথায় আকাশ পাতাল ভাবনা। হুঁ, তাহলে যা ভেবেছিলেন তাই বটে। ছেলে উচ্চশিক্ষিত

হলে কী হবে, ভাইদের বড্ড অনুগত। টাকাপয়সা, খাট আলমারি, রেডিও, ঘড়ি, মোটর সাইকেল—কিচ্ছু নেবে না বলে গেছে। শুনেই ভাইরা আগুন হয়েছে। কাজিসায়েবকে বড়ভাই ঠাট্টা করে বলেছিল, মিয়াসায়েব, নিজের মোটর সাইকেল চাপবেন, জামাই পায়ে হেঁটে কলেজে পড়াতে যাবে। আপনিই বলুন না, কেমন দেখায় এটা? কাজিসায়েব অপমানিত বোধ করছিলেন। খান-বাহাদুরের ছেলে কাজি মবিনুল হককে ময়লা লুঙিপরা মাঠের চাষা এমন কথা বলতে পারল। জমানাটাই বদলে গেছে কিনা! পথে মোজাম্মেল অবশ্য এজন্যে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিল ভাইদের হয়ে। তারপর সে রাতে সে নিজে এল রাণুর বড়দিকে সঙ্গে নিয়ে। অত লম্বাচওড়া বাতচিৎ করে গেল। লগনের দিন আর বিয়ের দিন পর্যন্ত ধার্য করে গেল নিজের মুখে। তারপর এই ব্যবহার! অত সাহস যদি নেই তোর, বড় ভাইদের যদি অত গোলাম তুই ব্যাটাচ্ছেলে, কেন এমন করে আগু বাড়িয়ে রোয়াব দেখতে এলি? ছি, ছি! এখন মুখ দেখানো ভার হবে লোকের কাছে। সবার আগে আবু খোনকার বাঁকা মুখে হাসবে। সন্ধ্যার নমাজ আজ বাড়িতেই সেরে নেবেন বরং। লগনের দিন লগন এল না, এমন বিটকেল কাণ্ড ভূভারতে কেউ শুনেছে?

কাজিসায়েব ভাবছিলেন, কাল সকালের বাসে নাজুকে একবার খবর নিতে পাঠাবেন নাকি? ওর মা বললে নিশ্চয় অমত করবে না নাজু।

নাকি নিজে যাবেন? তেমন কিছু বুঝলে আশরাফী (উঁচুজাত) বোলচাল ঝেড়ে আসবেন আতরাফের (নিচুজাত) মুখের ওপর। সে এক জমানা ছিল, যখন আশরাফ মুসলিমের সঙ্গে আতরাফ মুসলিম একাসনে বসার ঠাঁই পেত না। বিয়ে-সাদি সামাজিক সম্পর্ক তো দূরের কথা। সামাজিক অনুষ্ঠানে আতরাফরা আমন্ত্রিত হলে মেঝেয় বসত, আশরাফরা বসতেন উঁচু আসনে। কিন্তু না, মবিনকাজি চিরজীবন এসবের বিরোধী। রাণুর বিয়েটা হলে প্রমাণ করে

ছাড়ছেন, তিনি ইসলামের সঠিক অনুসরণ করেন। তার ওপর এই কুৎসিত বরপণপ্রথা ঢুকেছে মুসলিম সমাজে। ইসলামী শরীয়তে একেবারে গর্হিত প্রথা—এ একটা অনাচার। হিন্দুদের সংসর্গে জাতপাত ঢুকেছিল মুসলিম সমাজে। সেটা যদি যুগের হাওয়ায় উড়ে গেল তো হিন্দুদের আরেক প্রথা এসে মুসলমানের ঘরে ঢুকল। এক প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক রাণুর জন্য আঠারো হাজার নগদ টাকা চেয়েছিল। কী? না—ওই টাকায় ব্যবসা বাণিজ্য করবে। এ তার অনেক দিনের নাকি সাধ। হাসি পায়, দুঃখ হয়, আবার রাগও লাগে। এসবের বিরুদ্ধে তো কেউ ফোঁস করে ওঠে না? কাজি-সায়েবের ছেলেবেলায় কম বয়সেই বিয়ে হয়ে যেত মেয়েদের। পণের বালাই ছিল না। এখন কত ঘরে কত মুসলিম মেয়ে বুড়ি হয়ে যাচ্ছে, বর জোটে না। মিয়া-মোখাদিমের ঘরের মেয়েদের দুরবস্থা আরও বেশি। দেশভাগের পর শিক্ষিত আর মিয়া মোখাদিম—যারা আশরাফ, তারা ঝেঁটিয়ে চলে গেছেন পাকিস্তানে। পাল্টা ঘরের অভাবে মেয়ের বর জোটানো সমস্যা।

মসজিদ থেকে আজানের সুর ভেসে আসছে। কাজিসায়েব তখনও ইজিচেয়ারে পা ছড়িয়ে বসে এইসব আকাশ-পাতাল ভেবে রেগে যাচ্ছেন। আবার অসহায় বোধ করেছেন দেউড়ির দিকটায় ঘন গাছপালা। সেখানে অন্ধকার এসে হাঁটু দুমড়ে বসে আছে। পাশের ছোট্ট পুকুরের পাড়ে রাণুর বাগানে কার গরু এসে ঢুকেছে। ধবধবে সাদা রঙ গরুটার। কী এক আলৌকিক প্রাণী যেন। হতভাগী মেয়েটার সাধের ফুলবাগিচায় হানা দিয়েছে।

ময়নার মা সকাল সকাল বাড়ি যাবার পথে গরুটাকে তাড়িয়ে দিল।···

জয়ন্তীর অল্পস্বল্প বোঁচকাপত্তর গোছানো শেষ। কথামতো মালদা থেকে ভাইপো অমর, বউ আর কচি মেয়েকে নিয়ে পিসিমার বাড়ি পাহারা দিতে এসেছে আগের দিন। বসার ঘরে রেকর্ড-

প্লেয়ার বাজাচ্ছে অমরের বউ রত্না। রাণুকে দেখে বলল, আরে! আসুন আসুন! কেমন আছেন?

রাণু বলল, ভাল। আপনারা এসেছেন খবর পেয়েছি।

আসেননি যে?

এই তো এলাম। রাণু ভেতরের ঘরের দিকে তাকাল। বড়দি কই?

রাণুর গলা পেয়ে জয়ন্তী বেরিয়ে এলেন।···ভাবছিলাম, তুমি হয়তো স্টেশনেই থাকবে। সকালে বাজারে তোমার বাবার সঙ্গে দেখা হল। বললেন, লগন-টগন আসবে ইসলামপুর থেকে। বিয়েতে আমি থাকছি না শুনে ক্ষুব্ধ হলেন।··জয়ন্তী হাসলেন।··· নাই বা থাকলাম। দূর থেকে আশীর্বাদ করব।

রাণু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

জয়ন্তী বললেন, কী? তোমায় অমন দেখাচ্ছে কেন রাণু?

রাণু একটু হাসল।···কেমন দেখাচ্ছে?

জয়ন্তী হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।···দেখছ? অমরকে বললাম, রিকশো-টিকশোর দরকার নেই। ওই তো যৎসামান্য লগেজ। রাণুও এসে গেছে। তিনজনে এটুকু পথ বয়ে নিয়ে যেতাম!

রত্না বলল, কাছাকাছি রিকশো পায়নি হয়তো। এখনও অনেক সময় আছে ট্রেনের।

জয়ন্তী বললেন, রাণু, দাঁড়িয়ে কেন? বসো।

রাণু বসল।

জয়ন্তী তার পাশে বসে বললেন, সাউণ্ড একটু কমাও তো বউমা। আর দেখ, বন্টি ওঘরে কী সব ভাঙচুর করছে নাকি। যা দস্যি মেয়ে তোমার!

রত্না ভারি মুখে ভেতরের ঘরে চলে গেল। তারপর তার মেয়েকে বকাবকি করছে শোনা গেল। জয়ন্তী চাপা গলায় বললেন, ফিরে এসে দেখব সব তছনছ। একালের মায়েরা বাচ্চাদের বড্ড আস্কারা দেয়।

রাণু বলল, কবে ফিরছেন ?

দিন পাঁচ-সাত থাকব। ভাল না লাগলে কেটে পড়ব। জয়ন্তী ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন। তোমাকে এত রোগা দেখাচ্ছে কেন আজ ? নাকি আমার চোখের গণ্ডগোল ?

রাণু একটু হাসল।...ও কিছু না। বড়দি, আপনার কাছে একটা ভীষণ অপরাধ করে ফেলেছি। তাই ক্ষমা চাইতে এসেছি।

জয়ন্তী অবাক হয়ে বললেন, আমার কাছে অপরাধ করেছ ? সে কী !

হ্যাঁ বড়দি। ভীষণ—সাংঘাতিক অপরাধ।

আমি কিছু জানলাম না, আর তুমি...জয়ন্তী ওর দিকে একটু ঝুঁকে এলেন। এ কী! তুমি কাঁদছ ? কেন রাণু ? কী হয়েছে, খুলে বলো তো !

রাণু মুখ নামিয়ে দ্রুত চোখ মুছে আস্তে বলল, আপনাকে আমার বলা উচিত ছিল। কিন্তু সাহস পাইনি। কাল আমি গুণমালার ভাই বিমলকে ইসলামপুরে পাঠিয়েছিলাম।

ইসলামপুরে পাঠিয়েছিলে ? কেন ?

সেই ভদ্রলোকের কাছে।

মোজাম্মেলের কাছে ?

হ্যাঁ। একটা চিঠি লিখে পাঠিয়েছিলাম।

জয়ন্তী একটু চুপ করে থাকার পর নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, এ বিয়েতে তোমার মনের সায় নেই, আমি আঁচ করেছিলাম। তবু ভাবলাম, ছেলেটি বড় ভাল। তোমাকে জয় করে নেবে। তো... বাড়িতে জানিয়েছ ?

রাণু মাথা দোলাল।

ভুল করেছ। বুড়ো মানুষটি বড্ড দুঃখ পাবেন।

জানাব। রাণু গলার ভেতর বলল। কিন্তু আমাকে আপনি ক্ষমা করবেন না বড়দি ? রাণু ওঁর পায়ের দিকে হাত বাড়াল।

জয়ন্তী ওর হাতটা তুলে ধরে থাকলেন শক্তভাবে। জানো ?

আমিও একবার ঠিক তোমার মতো হঠাৎ করে সরে এসেছিলাম। বলবে, এ সেই লেজকাটা শেয়ালের গল্প হল। কিন্তু না—আমি তোমাকে কিছুতেই বলব না, তুমি এ কাজটা ঠিক করেছ। রাণু, আজ ভাবি, মানুষের জীবন সত্যি খুব ছোট নয়। অনেক বড়—অনেক সম্ভাবনায় ভরা। কিন্তু শুধুমাত্র যে কোনো একটা আঁকড়ে ধরে চলতে চাইলে পস্তাতে হয়। সর্বত্রগামী হওয়া উচিত। আমি একরোখা হয়ে চলতে চেষ্টা করেছি। অথচ কোথায় পৌঁছলাম? আবার এই চাকরির জীবনটা কত কদর্য, তা তো তুমি জানো। সারাক্ষণ ঝামেলা, নীচতা, ঈর্ষা, স্বার্থ, অকারণ বিদ্বেষ।...এ এক নরক। ইচ্ছে করে পালিয়ে যাই সব ছেড়ে। কিন্তু এ বয়সে আর যাব কোথায়?

জয়ন্তী একটু হাসলেন। · মাঝে মাঝে মনে হয়, কারুর বউ হয়ে দিব্যি ঘরকন্না করতে পারলে অন্তত খেয়োখেয়ি ঝামেলা থেকে বাঁচা যেত। কর্তার সেবা করেই খালাস! তাই না?

অমর এসে বলল, রিকশো এসে গেছে।

রাণু বলল, অমরবাবু কেমন আছেন?

রাণুকে দেখে অমর নমস্কার করল।...রত্না এসেই আপনার কথা বলছিল। রাণুদিকে না পেলে জমে না! গঙ্গায় নৌকোবিহারের প্রোগ্রাম কবে করছেন বলুন? সেবার যা জমেছিল না!

জয়ন্তী উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, বাড়ি ফেলে বেরুবার মতলব করো না, অমু। সাবধান! সব লুট হয়ে যাবে।

অমর বলল, না না। আমি আপনার প্রপার্টি পাহারা দেব, পিসিমা। ভাববেন না।

কই, জিনিসপত্র ওঠাও। জয়ন্তী নির্দেশ দিলেন। তুমি বরং এসব নিয়ে স্টেশনে গিয়ে বসো। আমি রাণুকে নিয়ে হেঁটেই যাই। এখনও ঘণ্টা দেড়েক সময় আছে।

রাণু বলল, এত আগে যাবেন?

স্টেশনের কাছের লোকেরা ট্রেন ফেল করে। জানো না?

রাত আটটার আগে আসে না কোনোদিন ট্রেনটা। কোনোদিন রাত দশটাও হয়।

তুমি থামো তো! জয়ন্তী কপট ধমক দিলেন রাণুকে। তারপর হাসিমুখে বললেন, স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে বসে সময় কাটাতে আমার ভারি ভাল লাগে, জানো রাণু? শেষদিকটায় গোড়া-বাঁধানো বকুল গাছটার তলায় বসে আমরা গপ্প করব। জায়গাটা বড্ড সুন্দর।

সোমবার রাণুব বিয়ে হত। দেউড়িতে রঙীন কাপড় মুড়ে নহবতখানা বানানো হত। মাইকে হিন্দি ফিল্মের গান বাজত। সোমবার সেই দেউড়ি খাঁ খাঁ, কোমরভাঙা বিদঘুটে চেহারায় দাঁড়িয়ে আছে। দাদীবুড়ি কাঠমল্লিকার ঝিমুনি ধরেছে। 'সন্ধ্যানীড়' লেখা সাদা পাথরের ফলকটা ঢেকে ফেলেছে মাকড়সার জাল। পোস্ট-ম্যান এলে ওখানে একটু দাঁড়িয়ে লেখাটার দিকে তাকিয়ে বাঁকা হাসে। এ বাড়ির চিঠিতে লেখা থাকে 'সন্ধ্যানীড়'!

সাইকেলের ঘন্টি শুনে রাণু বেরিয়ে এল।

নমস্কার দিদিমণি। চিঠি।

রাণুর বুক ধড়াস করে উঠেছিল।...কার চিঠি?

এমন করে তাকাল যেন কখনও এ বাড়ি চিঠি আসে না, তার কাছেও আসে না। তিনটে ডোরাকাটা খাম দিয়ে পোস্টম্যান চলে গেল। রাণুর তখন হাত কাঁপছে। খামগুলো ঝটপট দেখে নিল সে। আবুধাবির চিঠি। কাজিসায়েব, নাজিম আব রাণুর নামে। বুলি আর শাহাবুদ্দিন এতগুলো চিঠি লিখেছে। রাণু একটু হাসল।

কিন্তু কেন সে চমকে উঠেছিল অমন করে? কার চিঠি ভেবে-ছিল? ইসলামপুরের তো নয়ই। এমন চিঠি লিখে পাঠিয়েছে রাণু, এমন করে শাসিয়েছে, নির্বোধ লোকটা আর ভুলেও রাণুর নাম করবে না। গুণমালা বুদ্ধি না দিলে এমন উপায় খুঁজে বের করতে পারত না রাণু। তাহলে কার চিঠি ভেবেছিল সে? রাজা মিয়ার?

রাণু ঠোঁট কামড়ে ধরল। মনে মনে বলল, ধিক তোকে হতভাগিনী! এখনও মনের তলায় পাপ! প্রতারক লম্পট চরিত্রের একটা লোকের জন্য অবচেতনায় কী খেলা চলছে ভেবে রাণু অবাক হয়ে যায়।

কাজিসায়েব মনমরা হয়ে আছেন, তা তাঁর হাবভাবে স্পষ্ট। দলিজঘরে বসে মেডিরিয়া মেডিকার পাতা ঢুঁড়ে হন্যে হচ্ছেন, ওষুধ পাচ্ছেন না। ঠোঁটে বিড়বিড় করে অস্ফুট কী সব আওড়াচ্ছেন মুমূর্ষুর মতো। পাশে দাঁড়িয়ে আছে ঘোমটা ঢাকা একটি মেয়ে। তার কোলে রোগা বাচ্চাটা টেনেটেনে কাশছে। রাণু চিঠিটা দিয়ে বলল, বুলি। অমনি কাজিসায়েব সিধে হয়ে বসলেন।···শাহাবুদ্দিন! যাক গে, খুব ভাবছিলাম। খোদার ফজলে পৌঁছে গেছে।

রাণু নাজিমের চিঠিটা তার ঘরে রেখে নিজের ঘরে চলে এল। খামটার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ মনে হল, খুললেই বুলির একরাশ কান্না ঝরঝর করে তাকে ভিজিয়ে দেবে। বেচারী বুলি! নদীর কোলের মেয়ে, উজ্জ্বল তাজা সবুজ তার দুটি সুন্দর চোখে মাখানো আজীবন। কালো মোষের মতো বরের সঙ্গে ধু ধু রুক্ষ মরুভূমির দেশে গিয়ে খুব কষ্টে আছে। কষ্টের কথাটা বড়বোন ছাড়া কাকেই বা মুখ ফুটে জানাতে পারবে?

দুঃখের সঙ্গে খামটা ছিঁড়ল রাণু। ভাঁজ করা দুটো চিঠি বেরুল। বুলির হাতের লেখা বড়-বড় আর ঝরঝরে। রাণুর মতো জড়ানো নয়। ভাঁজ খুলতেই এক জায়গায় রাণুর চোখ আটকে গেল।

···জীবনে এত সুখের মুখ দেখব, ভাবিনি। আপা, তুমি কল্পনা করতে পারবে না আমি কোথায় আছি, বেহেশত কি এর চেয়ে সুন্দর? এখন বুঝতে পারছি, আমরা কত গরিব। শুধু আমরা কেন, কুতুবগঞ্জের বড়লোকরাও কত গরিব। তুমি চোখে না দেখলে কিছু বুঝবে না। কোথায় মরুভূমি? চারদিকে ঘন সবুজের মধ্যে বড়-বড় সুন্দর রঙ-বেরঙের বাড়ি। সুন্দর সব পার্ক। ফোয়ারাও কত। চওড়া রাস্তায় পিন পড়লেও দেখতে পাওয়া যায়।

মোটর গাড়ির কথা কী বলব? প্লেনের মতো গতি। তেমনি আরাম। বাইরে গরম হলে কী হবে? ঘরে, গাড়িতে এয়ার-কনডিশন করা। তুমি বলেছিলে, গরমে পুড়ে কালো হয়ে যাবি। সেসব কিচ্ছু না। কাল কী প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি হয়ে গেল, দেখলে ভাবতে, এ সেই কুতুবগঞ্জ। আমার বাথটাবে ঠাণ্ডা পানিতে গা ডুবিয়ে খালি তোমার কথা ভাবি। ভাবি, তুমি কত উল্টোপাল্টা কথা বলে আমাকে ভয় দেখাতে। জানো আপা? কাল আমরা অনেক দূরে একটা পাহাড়ী এলাকায় গিয়েছিলাম। সমুদ্রের ধারে পাহাড়ের ওপর আমেরিকান ক্লাব। একটা পার্টি ছিল। খুব হইচই হল। সায়েব-মেমরা নাচল। টাই-স্যুট পরা আরব ছিল দু'জন। আমার দিকে কেমন তাকাচ্ছিল। কিন্তু যা বলেছিলে, ওরা ততকিছু অসভ্য নয়। খুব সরল বলে মনে হল। আমাদের পাশের ফ্ল্যাটে এক আরব ফ্যামিলি থাকে। মেয়েরা মেম সেজে বেড়ায়। ইংরেজি বলে মেমদের মতো। আমার ইংরেজি বলতে বাধছে। অভ্যাস হয়ে যাবে। আর শোনো, তোমার দুলাভাই এখানে একটা ছেলে দেখেছেন। তবে বাঙালী না। কেরালার ছেলে। বড় ডাক্তার। তোমার দুলাভাই আব্বাকে এ ব্যাপারে এই সঙ্গে চিঠি দিচ্ছেন। যদি খোদার দয়ায় এটা হয়ে যায়, দুই বোন কাছাকাছি থাকব। তুমি যেন অমত করো না আপা।...

হঠাৎ রাণুর কী হল, কী এক প্রচণ্ড হিংসায় চিঠিটা দুমড়ে মুচড়ে দলা পাকাতে থাকল। তারপর কুচিকুচি করে ছিঁড়ে জানলার বাইরে ফেলে দিল।

তারপর শাহাবুদ্দিনের চিঠিটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। ছিঁড়ে কুচি করল। জানলা গলিয়ে ছুঁড়ে ফেলল।

দুপুরের দিকে এখন এলোমেলো হাওয়া বয়। সেই গরম লু হাওয়ায় কাগজের কুচিগুলো রাণুর যত্নে সাজানো ফুলের বাগানে ছড়িয়ে যেতে থাকল এখানে-ওখানে।...

নয়

বর্ষায় কুতুবগঞ্জের গঙ্গা আর সে চমক দেয় না। রাণুর ছোট-বেলায় জ্যৈষ্ঠসংক্রান্তির পর বহুদূরের পাহাড়ধোয়া গাঢ় হলুদ জল এসে যখন স্বচ্ছ কালো জলটাকে ঘুলিয়ে তুলত, চেনা মানুষ অচেনা হয়ে যাওয়ার মতো কী এক অস্বস্তি আর বিস্ময় জাগত মনে। বুড়িমা তলায় দাঁড়িয়ে রাণু অবাক চোখে তাকিয়ে থাকত ছোট-বেলায়। প্রতিবছরের কিছু আনন্দের স্মৃতি থেকেছে এ নদীর বুকের বালিয়াড়িতে, ডোবার মতো জমে থাকা কালো জলের শ্যাওলায়, মৌরালামাছের ঝাঁকে, আর রোদে ঝিলমিল করে ওঠা জলের তলার রুপোলি বালির কণায়। ঠিক বোঝাতে পারবে না রাণু, কেন গঙ্গার এই রূপটা তার এত ভাল লাগত—হয়তো আপন করে এ নদীকে করতলে পাচ্ছে বলেই কিংবা সে তার কাছে ছোট্ট হয়ে ধরা দিচ্ছে বলেই। কিন্তু বর্ষার গাঢ় রঙের ঢল নামার পর সব স্মৃতি, নিজের মতো করে নদীকে পাওয়া—সবটাই কোথায় হারিয়ে যেত। রাণু দেখত, কত বড় কত বিশাল এক রহস্যময় প্রবাহের সামনে সে দাঁড়িয়ে আছে এবং কত ছোট আর তুচ্ছ হয়ে গেছে সে। ভেবেছে বর্ষার নদী আর তার আপন নয়। তার রূপ দেখে ভয়ে গা ছম ছম করেছে তখন।

প্রতি বছর রাণু আর গুণমালাদের কাছে, আরও কত মানুষের কাছে গঙ্গার পরিচিত রূপ ছিল দুরকম। এখন গঙ্গার একটাই রূপ। ফরাক্কার ফিডার ক্যানেল থেকে বারোমাস জল আসছে। ঘোলা জলের স্রোত বইছে দুকুল ছাপিয়ে। বর্ষায় তার বিশেষ হেরফের হয় না। বড়জোর পাটোয়ারীজীর গদীর নিচে অব্দি জলটা চলে আসে। বুড়িমাতলার গোড়াটা একটু ডুবে যায়। নৌকাগুলো রেল লাইনের কাছাকাছি এসে ভেড়ে।

এবার বর্ষা এল খুব জাঁকিয়ে। কুতুবগঞ্জের গাছপালা বন সবুজ হয়ে উঠল। গঙ্গার ওপর সারাবেলা বৃষ্টি ধূসর পর্দা টাঙিয়ে রাখল। স্কুলে ছুটির পর কোনো-কোনো বিকেলে রাণু পায়ে হেঁটেই গঙ্গার ধারে-ধারে অনেকটা ঘুরে বাড়ি ফেরে। ভিজে জবুথবু হয়ে ফেরে। বই কাগজপত্র ব্যাগের ভেতর থাকে। ছাতিতে বৃষ্টি আটকায় না। জোহরা মেয়েকে দেখে অবাক হয়ে বলেন, এ কি পাগলামি বুঝিনে বাবা! রিকশো করে এলেই তো পারিস!

রাণু হাসে, ভিজলুমই বা একটু! আমাদের স্কুলের মেয়েরা ভিজতে ভিজতে বাড়ি ফেরে না বুঝি? ও মা, স্কুল-কলেজ থেকে ফেরার সময় আমিও বুঝি ভিজিনি কোনোদিন? তোমার মনে নেই কিছু?

রাণুর মধ্যে কী একটা পরিবর্তন এসেছে জোহরা আজকাল টের পান। এত বেশি চঞ্চল আর সপ্রতিভ তো ছিল না রাণু। তাছাড়া আরও অদ্ভুত লাগে, সারাক্ষণ বেশ হাসিখুশির মধ্যে আছে। তারপর হঠাৎ একটা তুচ্ছ কথায় প্রচণ্ড ক্ষেপে যায়। শালীনতাটুকুও যেন রাখতে চায় না। সেদিন সন্ধ্যা অব্দি বুড়িমাতলায় ওকে একা বসে থাকতে দেখেছিলেন কাজিসায়েব। বাড়ি ফিরে কথাটা তুলতেই বাবার মুখের ওপর রাণু কেমন করে কথা শুনিয়ে দিল। কাজিসায়েব চুপ করে গেলেন। তিনিও অবাক হয়েছিলেন, কত শান্ত মিষ্টিস্বভাবের ছিল তাঁর বড়মেয়ে! নাকি তার রোজগারে সংসার চলছে বলে দিনে দিনে দেমাক বেড়ে যাচ্ছে?

নাজিমও বদলেছে। তবে তার এই বদলটা ভারি স্বস্তিকর এবাড়িতে। শান্ত ভদ্র আর হিসেবীর মতো চালচলন তার। বাবার সঙ্গে সংসারের উন্নতির ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করে। পরে রাণু আড়ালে মাকে বলে, তাহলে জুয়াড়ির মেয়েকেই বউ করে ঘরে তুলছ, মা?

জোহরা বিব্রত মুখে বলেন, ওটা কথার কথা। জোয়ান বয়সে

এমন একটু আধটু বেগতিক হয়েই থাকে। সত্যিসত্যি বিয়ে করবে নাকি নাজু?'

রাণু শক্ত হয়ে বলে, যদি সত্যি করে?

জোহরা স্বভাবমতো ক্ষেপে যান। করবে। তাতে তোর কী? তোর মতো কি সবাই আইবুড়ো-আইবুড়ি থাকার পণ করেছে নাকি?

থামের ওপাশ থেকে মবিনকাজি বলেন, 'আহা! হলটা কী?'

জোহরা বলেন, 'হল কী সেটা তোমার গুণের বেটিকে জিগ্যেস করো। খালি নাজু নাজু নাজু—নাজু এই করল, নাজু সেই করল!'

বলে রাণুর দিকে ঘুরে চোখ কটমট করে ফের বলেন, করবে নাজু। পাঠানের মেয়েই বিয়ে করবে। কেন করবে না?

ঝোঁকের মুখে রাণু বলে ওঠে, তাহলে আমি এ বাড়িতে ঢুকব না বলে দিচ্ছি। যে-বাড়িতে একটা ছেনাল মেয়ে ঢুকবে, সে-বাড়িতে আমার থাকা চলে না।

জোহরা লাল চোখ করে তাকিয়ে থাকেন মেয়ের মুখের দিকে। মুখে কথা আসে না। রাণু গিয়ে নিজের ঘরে ঢোকে। জানলার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর ক্রমশঃ অবাক হতে থাকে। এমন কথা তো সে বলতে চায় নি! কেন তাহলে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল? ছোট ভাই প্রেম করে বিয়ে করছে—তাতে তার কেন এত আপত্তি হচ্ছে? কাশেম জুয়াড়ির মেয়েকে তো সে দেখেইনি আজ পর্যন্ত। জুয়াড়ির মেয়ে এবং একবার কার কাছে তালাক খেয়েছে বলেই সে ছেনাল হবে তার মানে কী?

তার চেয়ে বড় কথা, নাজুর মনে কষ্ট দিতেও তো তার বরাবর বড় অনিচ্ছা। অথচ দিনে-দিনে মনের ভেতর নাজুর বিরুদ্ধে যেন কী এক চাপা ক্ষোভ জমে উঠেছে। এ কি ঈর্ষা? ছোট ভাইয়ের প্রেমকে সে ঈর্ষা করছে নিজের জীবনের ব্যর্থতার জন্য?

আ ছি ছি! লজ্জায় দুঃখে কাঠ হয়ে যায় রাণু। চোখ ফেটে জল আসে। একটু পরে সে বেরিয়ে যায় তার বাগানের দিকে।

বর্ষার গন্ধ সঙ্গে সঙ্গে তাকে অন্যদিকে নিয়ে যায়—ফুলফলের সংসারে, উদ্ভিদের রহস্যে। এ বর্ষায় বহরমপুর থেকে কত ফুল আর ফলের বীজ এনেছে সে। মুনিশ দিয়ে বাঁশের মাচা বানিয়ে নিয়েছে শিম-শশা-লাউয়ের জন্য। সকালটা টিউশনি করে। বিকেলে স্কুল থেকে ফিরেই কোমরে আঁচল বেঁধে বাগানে ঢোকে। স্নেহে-ভালবাসায় তাকিয়ে থাকে তার নির্জন সংসারের দিকে। মনটা হাল্কা হয়ে যায়। রজনীগন্ধার সারবন্দী ঝাড়গুলোর কাছে বসে সে আবিষ্ট হাতে ঘাস ছেঁড়ে। দিনশেষে রজনীগন্ধার ঘ্রাণ, ভেজা মাটি, ঘাস লতাপাতার ঘ্রাণ, ঘাসফড়িং, প্রজাপতি, লাল নীল হলুদ রঙবেরঙের পোকামাকড়ের অদ্ভুত সব ঘ্রাণ তাকে খুব আদিম এক পৃথিবীতে পৌঁছে দেয়।

তারপর কী এক গভীরতর ব্যর্থতা ধীরে উঠে আসে সেই আদিম ভূমি থেকে—সন্ধ্যার আঁধারের মতো বৃষ্টির ফোঁটা পিঠে নিয়ে সে অবশ হয়ে বসে থাকে। বিষণ্ণ, ক্লান্ত। খালি মনে হয়, কী একটা ঘটবার কথা ছিল—বড় সুখকর আবেগময় কোনো ঘটনা। ঘটল না। যার জন্য এই বর্ষা, এইসব উদ্ভিদ, ফুল-ফল, এত করে নগ্ন মাটিকে সাজানোর আয়োজন—অথচ যা রোদ-বৃষ্টি-শীত-বাতাসের মতো সহজ ও স্বাভাবিক, তা তার ছোঁয়া হল না। ছুঁতে পারল না রাণু।

এক ছুটির দিনের দুপুরে বুড়িমাতলায় গিয়েছিল রাণু। আবার বুলির চিঠি এসেছে। বুলি দুঃখ করে লিখেছে। তোর চিঠিটা নিশ্চয় খোয়া গেছে, আপা। নৈলে পেতুম। বুলি কেরলের সেই ডাক্তারের কথা ফের লিখেছে। তাঁর জীবনযাপনের খুঁটিনাটি বিবরণ দিয়েছে। রাণু ভাবছিল, একটা ছোট করে জবাব দেওয়া দরকার। দেবে বরং। খুব স্পষ্ট জবাব দিতে হবে বুলিকে। বুলি কি তার দিদিকে চেনে না—জেনেশুনে ন্যাকামি করছে?

এ বর্ষায় গঙ্গার নতুন কোন রূপ নেই। গঙ্গা এখন তার মতোই হয়ে গেছে যেন। একটা জায়গায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে।

রাণু কতক্ষণ বসে থেকে উঠল। আনমনে হাঁটতে থাকল। পাটোয়ারীজীর গদির সামনে দিয়ে এগিয়ে সে জৈনমন্দিরের প্রাঙ্গণে ঢুকল। প্রাঙ্গণ পেরিয়ে ছোট দরজা দিয়ে বেরুল। ওখান থেকে একটা গলিপথ এগিয়ে কয়েকটা পুরনো বাড়ির পর আগাছার জঙ্গলে ঢুকেছে। জঙ্গলের পর মাঠ। ডাইনে স্কুল-এরিয়া। অন্যমনস্ক বিহ্বলতায় সে হাঁটছিল। হাঁটতে ইচ্ছে করছিল ছোটবেলার মতো। আকাশে মেঘ জমে আছে। জোরে হাওয়া বইছে গঙ্গার দিক থেকে। সে ঘুরে গঙ্গার পাড়ে গেল। তাবপর দেখল সেই জঙ্গলে ঘেরা গম্বুজঘরটার কাছে চলে এসেছে।

দূর বাবলাবনে একদঙ্গল মোষ চরছে। বাঁদিকে একটু তফাতে চলে গেছে রেললাইন ধনুকের মতো বেঁকে। পীরের আস্তানার জঙ্গলে মেঘের ছায়া। কুয়াসার চাদর জড়ানো বনভূমি এদিকে-ওদিকে। একটু ইতস্তত করে সে এগোল। ইচ্ছে করল, কিছুক্ষণ গম্বুজঘরের চত্বরে একা বসে থাকবে।

হেঁট হয়ে আগাছার ঝাড়ের সুড়ঙ্গপথে সে ভেতরে ঢুকল। তাকে দেখেই একটা খেঁকশিয়াল দ্রুত সরে গেল। একটু গা ছমছম করল রাণুর। চত্বরে বসার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি পড়তে থাকল টিপটিপিয়ে। তখন রাণু গম্বুজঘরের দরজার তলায় গিয়ে দাঁড়াল। জীর্ণ ফাটলধরা দেয়ালে অসংখ্য নাম লেখা আছে। অশ্লীল কথা লেখা আছে। নিঃসংকোচে খুঁটিয়ে পড়তে থাকল রাণু। তার মুখে হাসি খেলল মুহুর্মুহু। কতকাল এমন করে গোপনে অশ্লীল হওয়া যায় নি!

বৃষ্টিটা বেড়ে গেল ক্রমশঃ। তখন তার ঘোর কেটে গেল। খুব ভয় করতে থাকল। সে কি নষ্ট হয়ে যাবার জন্য এমন করে এখানে এসেছে? লজ্জায় শিউরে উঠল ভেবে, যদি কেউ এই গম্বুজঘর থেকে মেয়েদের স্কুলের এ্যাসিণ্ট্যাণ্ট হেডমিস্ট্রেসকে একা বেরুতে দেখে, কী ভাবতে পারে।

বৃষ্টির মধ্যে সে বেরিয়ে পড়ল। আলপথে দৌড়ে সোজা

আমবাগানে গিয়ে ঢুকল। একটু দাঁড়াল গাছের নিচে। তারপর বৃষ্টিটা ধরে এলে রাস্তায় পৌঁছুল। রেললাইনের সমান্তরালে কিছুটা এগিয়েই একটা রিকশো পেয়ে গেল। তখন খুব ভয়ে ভয়ে ভাবতে থাকল, সে কি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এমন করে?

বাড়ি ঢুকে সে টের পেল, তাকে নিশিতে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। নিজের অসহায়তা এমন করে কোনোদিন টের পায়নি সে। গোসলখানায় (স্নান ঘরে) ঢুকে স্নান করতে করতে রাণুর মাথায় জেদ চেপে গেল। মনে মনে বলল, বেশ করেছি। আমার খুশি। আমি এমনি করে নষ্ট হব—কার কী বলার আছে?

খেতে বসে জোহরা বললেন, ছিলি কোথায় রে? নাজু তোকে খুঁজতে গিয়েছিল। ফিরে এসে কতক্ষণ অপেক্ষা করে চলে গেল। পরের কাজ।

রাণু আনমনে বলল, কেন?

সে নাজু জানে।

রাণু একটু হাসল।·· বিয়ের দিন ঠিক করে ফেলেছে বুঝি?

জোহরা কোনো জবাব দিলেন না। খাওয়া শেষ করে রাণু তার ঘরে ঢুকল। দরজা এঁটে একটু ঘুমিয়ে নেবে ভাবল। একটা পত্রিকা এনেছিল বড়দির কাছে আগের দিন। পড়তে গিয়ে দেখল, চোখে অন্য কিছু ভাসছে—সেই বৃষ্টি ভেজা আবছা-কালো পুরনো গম্বুজঘরের অভ্যন্তর। বারবার চেষ্টা করেও ছাপানো হরফগুলো তার কাছে অর্থহীন হয়ে উঠতে থাকল। তখন সে বইটা রেখে চোখ বুজল। জরাজীর্ণ গম্বুজঘরটার ভেতর ঢুকে বসে রইল। ঝমঝম বৃষ্টির মধ্যে প্রাচীন গম্বুজঘরটা ক্রমশঃ জীবন্ত হয়ে উঠছিল। রাণু বিস্ফারিত চোখে আবিষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছিল, তার ভেতর চামচিকের নাদি, সাপের খোলস, ছত্রাক, শ্যাওলা, শীর্ণ পাণ্ডুর শেকড়-বাকড় বাড়িয়ে দিয়ে কাদের লোভাটে চাউনি—বড় ক্ষুধার্ত সেই গহ্বর। ভীত, আক্রান্ত, পলাতক প্রাণীর মতো রাণু সেই গহ্বরের ধারে চলে গিয়েছিল আজ ছুপুর বেলায়।···

একটু রাত করে নাজিম ফিরল। এ নতুন কিছু নয়। খেয়েদেয়ে সিগারেট ধরিয়ে সে গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে রাণুর ঘরের দরজায় এল। চাপা গলায় ডাকল, আপা! ঘুমোলি নাকি রে?

রাণু ঘুমোয় নি। বলল, কী?

দরজা তো খোল। তারপর বাতচিত করবি, বাবা।

যা বলার বাইরে থেকেই বল্‌না!

জোহরা বাইরে কোথায় ছিলেন। বললেন, ইস! আজকাল যেন লাটের বেটি হয়েছিস রাণু! ছেলেটা অমন করে সাধছে, আর তাকে মেজাজ দেখান হচ্ছে! চলে আয় নাজু! ও তোর বহিন নয়, দুশমন।

রাণু দরজা খুলতেই নাজিম ভেতরে ঢুকে গেল। অভ্যাসমতো টেবিলে বসে সে খিকখিক করে হাসতে লাগল। রাণু ভুরু কুঁচকে বলল, ফের নেশা করে আমার ঘরে ঢুকেছিস?

নাজিম জিভ কেটে বলল, তোর কিরে—মাইরি! আজ হারাম ছুঁইনি। একটা কথা শোন্।

রাণু বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসে বলল, ঘুম পাচ্ছে। কি বলছিলি, বল্।

নাজিম চাপা গলায় বলল, আজ সকালে বহরমপুরে এক কাণ্ড, বুঝলি? ব্রিজ পেরিয়ে ওয়াটার ট্যাংকের কাছে গাড়ি ঘুরিয়েছি, দেখি শালা ভোল পাল্টে নতুন খেলা পেতেছে। গাছতলায় গাড়ি দাঁড় করালুম। তাপরে···

রাণু ধমক দিল, ফের শালাটালা?

নাজিম ফিক করে হাসল।···তুইও তো বলছিস! মাইরি, এম এ বি টি পাশ করলে যেন মেয়েছেলের জিওগ্র্যাফি বদলে যায়! যা বলছি, ঠাণ্ডা মাথায় শোন। রাজাশালাকে আজ ধরে ফেলেছিলুম, বুঝলি?

রাণু তাকাল। কিছু বলল না।

শালা এখন জড়িবুটি ওষুধপত্তর বেচছে। নাজিম খিকখিক করে হাসতে লাগল। মাইরি, তোর গা ছুঁয়ে বলছি আপা! রাজামিয়া এখন বত্তি সেজেছে! ফুসমন্তর আওড়াচ্ছে। ম্যাজিকও দেখাচ্ছে। তার ফাঁকে সাপের ল্যাজ, পেঁচার ঠোঁট, বাদুড়ের নখ, ভালুকের রোঁয়া—উরে শালা! আমি তো দেখে তাজ্জব।

দম নিয়ে নাজিম ফের বলল, হরবোলাগিরি কিন্তু ছাড়ে নি। লোক জড়ো করতে হবে তো? এদিকে ড্রেসের ঘটা দেখলে ভিরমি খাবি, আপা। মাথায় ফেল্টহ্যাট, গলায় টাই, সে এক দারুণ সায়েব। যেন এক্ষুনি বিলেত থেকে এল। মুখে পাইপ সুদ্ধু! ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে টানছে আর বুলি ঝাড়ছে ইংরিজিতে।

রাণু আলতো হেসে বলল, যাঃ!

বিশ্বাস হচ্ছে না? বেশ—জগুকে জিগ্যেস করিস। আমাকে দেখে শালি ঘাবড়ে গেল। কিন্তু কথা বললে না। যেন চেনেই না। তো আমি বাবা কুতুবগঞ্জের সেই নাজু। সোজা গিয়ে বললুম, কী মিয়া, চিনতে পারছ না যে? আমার শ্বশুর কাশেম খাঁর চল্লিশটে টাকা মেরে গা ঢাকা দিয়েছিলে। নাও, ঝাড়ো দিকিনি টাকাগুলো! জলদি!

রাণু অবাক হয়ে বলল, কাশেম জুয়াড়িকে শ্বশুর বলে ফেললি? বিয়ে করে ফেলেছিস তাহলে?

নাজিম হাসল।...আরে না, না। কথার কথা। শালাকে ঝাড়তে হবে তো?

রাণু দম আটকানো গলায় বলল, তারপর?

ঝামেলা বেধে গেল। ওর টাই চেপে ধরলুম। নাজিম বাঁকা মুখে বলল, শালার গায়ে তো একরত্তি জোর নেই, কিন্তু কুলো-পানা চক্কর। ড্যাগার বের করল।

রাণু শিউরে উঠে বলল, সে কী!

এ বাবা কুতুবগঞ্জের নাজু। ড্যাগার কেড়ে নিলুম। তারপর

ঝাড়লুম মনের সুখে ঢুঁই ঢাঁই…ঢুস্…ঢাস্। নাজিম তার ঘুসির বর্ণনা দিতে থাকল।

রাণুর শরীর অবশ হয়ে গেল। খুব আস্তে বলল, খামোকা লোকটাকে মারলি?

আমার মুন্নির হাত ধরে টেনেছিল।

রাণু শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, তোর মুন্নি!

আবার কার? নাজিম সিগারেটের ছাই জানলা গলিয়ে ফেলে ফের বলল, বিয়েটাই যা বাকি।

নির্লজ্জ কোথাকার! বড় বোনের সামনে এসব কথা বলতে লজ্জা হয় না তোর? রাণু ক্ষেপে গেল যেন। যার নিজের এতটুকু মর‍্যালিটি-বোধ নেই, সে অন্যের মর‍্যালিটি নিয়ে মাথা ঘামায়। যা—বেরো আমার ঘর থেকে।

নাজিম উঠে দাঁড়িয়ে বলল, যা বাবা! তোর এত রাগ কেন বল্‌তো আপা?

রাণু তাকে ঠেলে ঘর থেকে বের করে দিয়ে খিল এঁটে দিল। বাইরে নাজিম হো হো করে হাসছে। অন্ধকার মেঘলা রাতে হাসিটা পিশাচের মতো মনে হল। মবিনকাজীর গলা শোনা গেলে একবার। কী, হল কী? নাজু অত হাসছে কেন? কেউ জবাব দিল না।

রাণু টেবিলের সুদৃশ্য কেরোসিন বাতিটা নিভিয়ে মশারির ভেতর ঢুকতে গিয়ে টের পেল তার শরীরে যেন এতটুকু জোর নেই।

সে চিত হয়ে শুল। জানলার বাইরে তার ছোট্ট ফুলফলের বাগান থেকে বর্ষার গন্ধ আর ফুলের গন্ধের সঙ্গে হাজার-হাজার পোকা-মাকড়ের ডাক একাকার হয়ে শব্দেগন্ধে ওতপ্রোত একটা আচ্ছাদন কবরের মতো তাকে ঢাকতে থাকল। আচ্ছন্ন অবস্থায় শুয়ে রইল সে।

কুতুবগঞ্জের বনভূমির নির্জন রাস্তা, খোজাদের গোরস্তান আর পীরের মাজারের স্মৃতির ভেতর সেই সুন্দর গুণী বাউণ্ডুলে লোকটা

আবার তীব্রভাবে মনে ভেসে এল। যখন এল, দেখল তার এই আসাটাকে রাণু রাধা দিতে পারছে না। তারপর আতঙ্কে দুঃখে সে দেখতে থাকল, নাজিম—তারই ভাই নাজিম মানুষটাকে নিষ্ঠুর-ভাবে আঘাত করছে। চোখের সামনে দেখছে, আঘাতে-আঘাতে লোকটা রক্তাক্ত অবস্থায় মুখ থুবড়ে পড়েছে। তাকে রক্ষা করার কেউ নেই। নাজিম রাণুর জীবনের এক গ্রীষ্মকালীন সুন্দর সকালকেই মেরে শুইয়ে দিল বর্ষার রাতের ভেজা পৃথিবীতে। শয়তান নাজিম!···

সেদিন বুলি আর তার বরকে এতদিন পরে চিঠি লিখে পোস্ট করে হাঁটতে হাঁটতে স্কুলে গেল রাণু। একটু দূর থেকে দেখল গেটের কাছে একদঙ্গল মেয়ে দাঁড়িয়ে জটলা করছে। রাণুকে দেখে ওরা অভ্যর্থনার ভংগিতে হইচই করে এগিয়ে এল। রাণু অবাক হয়ে বলল, কী ব্যাপার?

ক্লাস নাইন-টেনের মেয়ে সব। একগলায় বলে উঠল, মেজদি! মেজদি! বড়দিকে টিট্ করেছি!

রাণু হাঁ করে তাকিয়ে রইল ওদের মুখের দিকে।

ওরা খিলখিল করে হেসে উঠল। তারপর ক্লাস টেনের পুষ্পিতা বলল, বুঝলেন না মেজদি? ম্যাগাজিন ম্যাগাজিন!

রাণু হাসল। কী? বড়দি রাজি হলেন বুঝি?

ছবি বলল, আজ সকালে আমরা বড়দির কোয়ার্টারে গিয়ে ধর্না দিয়েছিলুম, জানেন?

মধুমিতা হেডমিস্ট্রেস জয়ন্তী দেবীর গলার স্বর আর ভংগি নকল করে বলল, হ্যাঁ—তোমাদের মেজদি তো বলছে অনেকদিন থেকে। তবে দেখ মেয়েরা, সামনে-হাফইয়ার্লি এক্সাম—তারপর সিলেবাসের যা অবস্থা!······

হাসতে হাসতে থেমে গেল ছবি। রীতা বলল, এখন সব আপনার ওপর ডিপেণ্ড্ করছে মেজদি!

রাণু খুশি হয়ে বলল, বেশ তো। লেখা দাও তোমরা।

বাঃ! ব্রততী বলল। লেখা তো দেব। আমরা একেবারে লেখার জাহাজ, মেজদি! কিন্তু স্কুলফাণ্ড্ থেকে মোটে যাট টাকার বেশি দেবেন না বড়দি।

ব্রততীর বাবার প্রেস আছে কুতুবগঞ্জে। ব্রততী খরচের কথা বলতে বলতে রাণুর সঙ্গে চলল। প্রাঙ্গণের মাঝখানে নতুন টিচার চৈতালী দাঁড়িয়ে গল্প করছিল কয়েকটি মেয়ের সঙ্গে। রাণুকে দেখে এগিয়ে এল। রাণুদি, কাল ভাবছিলুম তোমাদের বাড়ি যাব। চিনিই না। তাছাড়া ভাবলুম, কৈ, রাণুদি তো আমায় যেতে বলেনি!

সে হাসল। রাণু ওর কাঁধে থাপ্পড় মেরে বলল, বলো—মুসলমানের বাড়ি যেতে ভয় করে!

চৈতালীর কথা শোনা গেল না মেয়েদের হল্লায়। স্কুলে এতকাল পরে ম্যাগাজিন বেরুবে, এটা সুখবর হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। রাণুকে চারদিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে প্রশ্ন করছে ওরা। রাণু বারান্দায় ওঠে বলল, আজ স্কুলের ছুটির পর তোমরা যারা এতে ইণ্টারেস্টেড, তাদের নিয়ে একটু বসব। একটা কমিটি করা দরকার তো। ম্যাগাজিন কমিটি হবে। বড়দিকেও থাকতে বলব। এখন সব ক্লাসে যাও।

রাণু লাইব্রেরিরুমে ঢুকল। দিদিমণিরা এসে গেছেন। সে পাশের ঘরের পর্দা তুলে দেখে নিল জয়ন্তী এসেছেন কি না। আসেন নি, তা বাইরের হল্লা শুনেই বোঝা উচিত ছিল তার। বড়দির কালো ছাতিটা প্রাঙ্গণঘেরা পাঁচিলের ওপাশে দেখামাত্র সারা স্কুলবাড়ি চুপ করে যায়!

চৈতালী এসে বলল, রাণুদি, শুনুন।

চৈতালী গ্রীষ্মের ছুটির পর জয়েন করেছে স্কুলে। অর্থনীতির গ্রাজুয়েট। বি এড ডিগ্রিটাও নিয়েছে। রোগা, শ্যামলা, শান্তস্বভাবের এই নতুন টিচারের বয়স রাণুর চেয়ে অনেক কম। রাণু টের পায়, চৈতালীর সব কিছু যেন সুখের নয়। ওর হঠাৎ অন্যমনস্ক

হয়ে ওঠা, হঠাৎ কথা বলতে বলতে দূরের দিকে তাকানো, আর চোখের তলায় কালচে ছোপটার মধ্যেও যেন সেই গোপন দুঃখের কথাটা লেখা আছে বলে হয় রাণুর। তাছাড়া কোন বয়স্কা টিচারের পরচর্চার বা স্কুল-রাজনীতির আখড়ায় চৈতালী যোগ দেয় না। রাণুর এটাই খুব ভাল লাগে।

চৈতালীর কাঁধে হাত রেখে একটু একান্তে গেল রাণু। বলল, তখন আমার কথায় রাগ হয়েছে বুঝি?

চৈতালী আস্তে বলল, হওয়া স্বাভাবিক। আপনার কি তাই মনে হয় আমায় দেখে?

কিছু মনে হয় না। তুমি আমাকে ক্ষমাঘেন্না করে দাও চৈতালী। রাণু হাসতে লাগল। শেষে বলল, তুমি কি একথাই বলতে ডাকলে?

চৈতালী ম্লান হাসল। কথা একটু আছে। ছুটির পর একসঙ্গে যেতে যেতে বলব রাণুদি!

জাস্ট একটু হিন্ট্ দাও না ভাই!

চৈতালী চাপা গলায় বলল, মাধবীদির সঙ্গে থাকা আমার পোষাচ্ছে না। পরে বলব। বলে সে চলে গেল বইয়ের আলমারির দিকে। একটা বই টেনে নিয়ে বসে পড়ল।

এতক্ষণে বাইরের কোলাহলটা হঠাৎ থেমে গেল। মেয়েরা যে-যার ক্লাসরুমে ঢুকে পড়েছে। স্কুলবাড়িতে এখন খালি ধুপধুপ অসংখ্য পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। জয়ন্তী সোজা তাঁর ঘরে ঢুকলে ঢঙঢঙ করে ঘণ্টা বেজে উঠল। নিখুঁতভাবে হিসেব করেই জয়ন্তী স্কুলে আসেন।

রাণুকে দেখে একটু হেসে বললেন, বসো। মেয়েরা তো ম্যাগাজিনের জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে। স্কুল ফাণ্ডের ওপর ভরসা না করে নিজেরা চাঁদা করে ছাপতে পারে তো ছাপুক। কী বলো?

আপনি তো বাটটাকা করে দেবেন বলেছেন!

মোটেও না। জয়ন্তী শক্তমুখে বললেন। ওরা তাই রটাচ্ছে

বুঝি? আমি বলেছি, চেষ্টা করব। কমিটি রাজি হলে হবে। কিন্তু তুমি তো জানো, কমিটির লোকগুলো কে বা কারা। এই এঁদো জায়গায় কি সাহিত্য-টাহিত্য বোঝে? উল্টে বলে বসলেই হল পদ্যটদ্য লিখে মেয়েদের পড়াশুনা রসাতলে যাবে!

রাণু চুপ করে রইল।

জয়ন্তী মিটিমিটি হেসে বললেন, আমি কিছু জানি না ভাবছ? তুমিই তো প্রভোকেশানের পেছনে।

রাণু অপরাধীর মতো হাসল।

জয়ন্তী একটু ঝুঁকে এসে বললেন, তোমায় অমন দেখাচ্ছে কেন রাণু?

কেমন? রাণু সোজা হয়ে বলল। আমি তো অলরাইট।

তোমার শরীরটার দিকে মন দেওয়া উচিত। ঘরে আয়না তো আছে দেখেছিলুম—এ বিগ ড্রেসিং টেবিল। দেখিনি? জয়ন্তী ভুরু কুঁচকে তেমনি মিটিমিটি হাসছিলেন। মধ্যে কিছুদিন তোমার স্বাস্থ্যটা খুব ভাল—আই মিন উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। রাতে ঘুমটুম কেমন হয়?

রাণু মাথা নাড়ল।

ক্ষিদে?

রাণু উঠে দাঁড়াল। বিব্রতভাবে বলল, না। আমার কিছু হয় নি বড়দি।

এখন ক্লাস আছে তো?

আছে।

একমিনিট। টেবিলে কাগজ দেখে জয়ন্তী বললেন। থার্ড পিরিয়ডে তোমার অফ আছে। কিছু জরুরী কাজে বসব। চলে এস। কেমন? আর শোনো—তখন তোমার সঙ্গে ম্যাগাজিন নিয়ে কথা বলব।

রাণু বলল, ছুটির পর মেয়েদের নিয়ে বসব ভাবছি। আপনাকেও থাকতে হবে।

ওয়েল। দেখা যাবে।

রাণু বেরিয়ে এল। ক্লাসের ঘণ্টা বাজছে এখন। ক্লাস টেনে ফার্স্ট পিরিয়ডে বাংলা সাহিত্য। রাণু একটা বই আর চক নিয়ে হনহন করে ক্লাসে গিয়ে ঢুকল।

আজ দিনটা ছিল ভারি আরামদায়ক। আকাশভরা মেঘ ছিল। কিন্তু এক ফোঁটা বৃষ্টি ঝরেনি। বাতাস ছিল স্নিগ্ধ। কাঞ্চনফুলের গাছটার গোড়া অনেকটা চওড়া করে বাঁধানো। সেখানে ভিড় করে বসে ম্যাগাজিন কমিটি হল। জয়ন্তী সভাপতি। পত্রিকার উপদেষ্টা বোর্ডও হল। সবার মনরাখা করে এসব কমিটি করতে হয় রাণু জানে। কিন্তু তাকেই সম্পাদক হতে হল মেয়েদের দাবি মেনে। ব্রততী ছাত্রীদের পক্ষ থেকে সহ-সম্পাদক হল। এতসব কাগুজে কাজ সেরে রাণু যখন উঠল, তখন খুব উৎসাহী কিছু মেয়ে ছাড়া অন্যেরা সব কেটে পড়েছে। তাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে গেটের কাছে গিয়ে রাণু দেখল, চৈতালী রাস্তার ওধারে গঙ্গার পাড়ে একা চুপ করে বসে আছে একটা পামগাছের নিচে। ওখানে প্রাচীন আমলের সেই বাঁধানো ঘাট আর ইতস্তত কয়েকটা পামগাছ দাঁড়িয়ে আছে।

ছাত্রীদের যেতে বলে রাণু চৈতালীর কাছে গেল। তার পাশে বসে বলল, কী ব্যাপার? এমন করে বসে আছ যে?

চৈতালী একটা ঘাস দাঁতে কাটছিল। ফেলে দিয়ে হাসল। সন্ধ্যা অব্দি রোজ এখানে একটু বসে যাই জানেন না বুঝি?

লক্ষ্য করিনি তো। রাণু পা ছড়িয়ে দিয়ে গঙ্গার দিকে তাকাল। এখানে আমিও একসময় বসে থাকতুম সন্ধে অব্দি। তখন অবশ্য ছাত্রী ছিলুম। পাটোয়ারীনীর মেয়ে গুণমালীকে তুমি চেন না। এলে আলাপ করিয়ে দেব। গুণমালা আর আমি ছিলুম এই ঘাটের সৌন্দর্য-পূজারী—থুড়ি! পূজারিণী।

রাণুর মনটা আজ খুব ভাল। সে এই বাঁধানো সুন্দর ঘাটের গল্প করতে থাকল। এখানে কতবার কলকাতা থেকে ফিল্মের সুটিং করতে

স্যুটিং করতে এসেছে, তাও বলল। একটু দূরে বিশাল একটা বাড়ির পেছনের চত্বরে পুরনো আমলের একটি সাদা বজরা ডাঙায় তুলে রাখা হয়েছে। সেটার ইতিহাসও শোনাল। তারপর বলল, কিন্তু সময় খুব বদলে গেছে, জানো চৈতালী? কুতুবগঞ্জে রাজ্যের গুণ্ডাবদমাস এসে জুটেছে। তাছাড়া সব জায়গার মতো এখানেও মস্তান-জেনারেশানের উদ্ভব হয়েছে। সেজন্যে তোমাকে বলছি, এমন করে একা এখানে সন্ধ্যাঅব্দি বসে থেকোনা।

চৈতালী একটু হাসল।···আমি কাটোয়ার মেয়ে। আমায় কী বলছেন!

তখন মিটিঙের সময় তোমাকে কত খুঁজলুম। তোমাকে আমরা ম্যাগাজিন কমিটিতে নিয়েছি।

কবিতা ছাপতে হবে তাহলে।

ছাপব। রাণু ওর হাতটা নিল। তুমি কবিতা লেখ নাকি?

কে লেখেনা? আপনিও নিশ্চয় লেখেন।

রাণু মাথা দোলাল।···হ্যাঁ, কী বলতে বলেছিলে যেন। মিসেস ঘোষের সঙ্গে গণ্ডগোল কেন?

চৈতালীর মুখের রেখা বদলে গেল। গম্ভীর হয়ে বলল, মাধবীদি তো ভালই। কিন্তু ওঁর কর্তা ভদ্রলোকটি মোটেও ভদ্রলোক নন। ওখানে আমার থাকা পোষাচ্ছে না রাণুদি।

ব্যাপারটা কী, খুলে বলবে?

খুলে কী বলার আছে? চৈতালি বিকৃত মুখে বলল। আপনি আমায় একটা থাকার জায়গা খুঁজে দিন, রাণুদি।

রাণু ভাবতে থাকল। জৈন ব্যবসায়ী আর হিন্দু জমিদারদের কয়েকটা পোড়ো বাড়ি মেরামত করে নিয়ে স্কুল আর শিক্ষকদের কোয়ার্টার হয়েছে। কিন্তু তাতে কুলোয় না। দু'তিন জন টিচারকে বাইরে বাসা ভাড়া করে থাকতে হচ্ছে। পাটোয়ারীজী নতুন বাড়ি করে দেবার চেষ্টায় আছেন। সে কবে হবে, কে জানে। কিন্তু কুতুবগঞ্জে বাসা পাওয়াটাও বড় সমস্যা। ভাড়া দেবার জন্য বাড়ি

বানানোর রেওয়াজ এখনও তত শুরু হয়নি। কিছু হয়েছে, সরকারী লোকেরাই তাতে ঢুকে পড়েছেন। রাণু কিছুক্ষণ ভেবে বলল, বড়দিকে বলছি। পাটোয়ারিজীকেও বলব কী করা যায়। সত্যি তো, মাধবীদির সঙ্গে কীভাবে থাকবে? তোমার প্রাইভেসির প্রব্লেম আছে।

রাণু উঠল। বলল, ওঠ। সন্ধ্যায় এদিকটা নিরাপদ নয়। তাছাড়া ওপারে আকাশের অবস্থা খারাপ মনে হচ্ছে। বৃষ্টি এসে যাবে।

চৈতালী পাশে হাঁটতে হাঁটতে বলল, আপনাদের বাড়িতে ঘর-টর এক্সট্রা নেই?

রাণু হাসল।…থাকলেও তোমাকে দেওয়া যেত না। কেন জানো? তোমারই স্বার্থে। মুসলমানবাড়ি হিন্দু মেয়ে—তোমার মতো আইবুড়ো মেয়ে থাকবে, এটা কুতুবগঞ্জ ভাল চোখে দেখবে না। আসলে বাইরে-বাইরে শহর, ভেতরে বনেদী গ্রাম। হয়তো শেষ পর্যন্ত মিথ্যে কেলেংকারির দায়ে চাকরিটি খোয়াবে। বুঝেছ আমার কথা?

চৈতালী চুপ করে থাকল।

রেললাইন পেরিয়ে বাজার এলাকায় পৌঁছে রাণু বলল, পৌঁছে দিয়ে আসব?

চৈতালী যেন রাণুকে ছাড়তে চাইছিল না। কুণ্ঠিতভাবে বলল, চলুন না রাণুদি, কোনো রেস্তোরাঁয় গিয়ে চা-ফা খেতে-খেতে আরও কিছুক্ষণ গল্প করি।

তার কথার সুরে অসহায় একাকিত্বের ছোঁয়া ছিল। টের পেয়ে রাণু বলল, রেস্তোরাঁ আছে। তবে মেয়েদের আড্ডা দেওয়ার মতো নয়। স্টেশনের কাফেতে যাওয়া যেত। কিন্তু বড্ড ভিড়। শোনো, আমাদের বাড়ি এস বরং। কিছুক্ষণ আড্ডা দিয়ে তোমাকে পৌঁছে দিয়ে যাব মাধবীদির কাছে।

আলোয় ঝলমল করছে চারদিক। রিকশো, টেম্পো, লরি, বাস

আর মানুষজন মিলে সন্ধ্যার কুতুবগঞ্জ দেমাকে ফেটে পড়ছে। মাঝে মাঝে রেললাইনের শান্টিং ইয়ার্ড থেকে ইঞ্জিনের তীক্ষ্ণ হুইসল, কখনও ট্রেন আর মালগাড়ি পাশাপাশি এগিয়ে স্টেশনে ঢোকার তুমুল শব্দ। তারপর বৃষ্টি এসে গেল ঝমঝমিয়ে। রাণু চৈতালীকে নিয়ে একটা সাইকেল রিকশায় চেপে বসল—জোর করেই। রিকশোওলারা তাকে চেনে। তারা জানে কাজিসায়েবের মেয়ের হাত খুব দরাজ। অন্যযাত্রী হলে এই বৃষ্টিতে তারা প্যাডেল ঠেলতে রাজী হত না।

কাজিসায়েব তার হোমিওপ্যাথির ডাক্তারখানা অর্থাৎ 'দলিজঘর' খুলে ইজিচেয়ারে বসেছিলেন। টেবিলে হেরিকেন। 'সন্ধ্যানীড়' লেখা ভাঙা দেউড়ি পেরিয়ে সাইকেল রিকশো বারান্দা ঘেঁষে থামলে হেরিকেন তুলে বেরিয়ে এলেন। বললেন, রাণু এলি?

রাণু চৈতালীকে বলল, আমাদের বাড়ি ইলেকট্রিসিটি নেই কিন্তু। তারপর সে আব্বার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল চৈতালীর।

চৈতালী ঢিপ করে প্রণাম করে বসল। কাজিসায়েব বিব্রত ভংগিতে একটু পিছিয়ে গিয়ে বললেন, আহা, থাক্ থাক্ মা। করুণাময় মঙ্গল করুন। রাণু, ভেতরে নিয়ে যা।

চৈতালী একটু হেসে বলল, আপনার সঙ্গে আমার বড়মামার দারুণ মিল আছে। বড়মামার মুখেও আপনার মতো দাড়ি।

মবিন কাজি নির্মল হেসে বললেন, মানুষের জাতধর্মটা ওপরকার জিনিস, মা। ভেতরে সবাই দুপেয়ে জীব। এই যে ধরো, হোমিও-প্যাথির ওষুধ দিই—ধর নাক্সভমিকা এক ডোজ। কেমন তো? এ জিনিস তোমার দেহে যেমন, তেমনি রাণুর দেহেও ক্রিয়া করবে। তার বেলা হিন্দু মুসলমান নেই রে বেটি!

কাজিসায়েব প্রাণ খুলে হাসতে থাকলেন। ভেতরের বারান্দা হয়ে রাণু সটান নিজের ঘরে নিয়ে গেল চৈতালীকে। চৈতালী বলল, মায়ের সঙ্গে পরিচয় করালেন না রাণুদি?

হচ্ছে। বলে রাণু টেবিলের কেরোসিনবাতির দম বাড়িয়ে

দিল। জোহরা মেয়ের ঘরে বাতি জ্বেলে শাকসুতরো করে গুছিয়ে রাখতে ভোলেন না। রাণু তার বাগানের জানলাটা খুলে দিল। বাইরে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি পড়ছে। রাণু বলল, ওখানে আমার সংসার, জানো চৈতালী?

কিসের সংসার বলুন তো?

গাছপালার। ফুলের। রাণু আবিষ্টভাবে বলল। বৃষ্টি না হলে জানলা খোলার সঙ্গে সঙ্গে একরাশ মিষ্টি গন্ধ ঝাঁপিয়ে আসত ঘরে। আমার প্রতিদিন বাড়ি ফেরার এটাই বড় সুখ, চৈতালী।

চৈতালী চোখে দুষ্টুমি ফুটিয়ে বলল, মা ঘরে ফিরলে ছেলেপুলেরা যেমন ঝাঁকিয়ে কোলে চড়ে!

রাণু তার চিবুক নেড়ে দিয়ে বলল, দুষ্টু মেয়ে। কাপড় বদলাবে নাকি? কতটা ভিজেছ দেখি।

চৈতালী বলল, একটুও না।

বসো। চায়ের কথা বলে আসি মাকে। সে পা বাড়াতে গিয়ে ঘুরে ফের চাপা গলায় বলল, জানো? আমার মা সারাদিন সারাক্ষণ বাটির পর বাটি চা খান! তবে সে চা তুমি হজম করতে পারবে না। ভোরে নমাজ পড়ার আগে চা চিনি দুধ জল একটা পাতিলে চাপিয়ে রাখেন উনোনে। সারাদিন চাপানো থাকে। মাঝে মাঝে বাটিতে ঢেলে খান। অবিশ্বাস্য ব্যাপার চৈতালী! তবে ভয় পেও না, তোমার জন্য স্বাভাবিক চাই হবে।

চৈতালী চেয়ারে বসে বৃষ্টির শব্দ শুনতে থাকল।...

মধ্যরাতে বৃষ্টির তীব্রতা কমেছে। কিন্তু হাওয়া বেড়েছে। মশারি থেকে হাত বের করে রাণু দেখছে জানলা দিয়ে ছাঁট আসছে নাকি। একটু আধটু এলেও জানলা বন্ধ করে নি।

পাশে চৈতালী শুয়ে আছে। মাধবীদি একটু উদ্বিগ্ন হতে পারেন, তাঁর স্বামী ভদ্রলোক হয়তো আরও বেশি। কিন্তু এত

বেশি বৃষ্টি হলে কী আর করার ছিল! সকালে রাণু সঙ্গে করে পৌঁছে দেবে।

রাণু বলল, হুঁ—তারপর?

তারপর আর কী? চৈতালী ধরা গলায় বলল। পাপ আমায় ছুঁল—কিংবা পাপকে আমি ছুঁলুম। আমি কিছু তলিয়ে ভাবিনি রাণুদি, বিশ্বাস করুন। বরাবর বড্ড বোকা আমি। পুরুষমানুষদের ভাল করে বুঝতুম না।

রাণু চুপ করে থাকার পর বলল, তুমি বাধা দিলে না কেন?

চৈতালী আস্তে বলল, দেবার মুখ ছিল কি? ওর কথা মেনে বোকার মত চলে এসেছি। দীঘায় পৌঁছে একবার মনে হল, আলাদা থাকার ব্যবস্থা করি। মেয়েদের জন্য যদি কোথাও ডর্মিটরি থাকে, খুঁজে দেখি। কিন্তু ও ছাড়ল না। সৈকতাবাসে নিয়ে গেল। ঘর বুক করা ছিল দেখে অবাক হলুম। কিন্তু তখন তো আমি প্রায় স্রোতে ভাসছি। তাছাড়া ঘরে ঢুকতেই ও পকেট থেকে একটা সিঁদুর প্যাকেট বের করল।

সে কী! তারপর?

পরিয়ে দিল। বলল, এটাই আসল অনুষ্ঠান। পরে রেজিস্ট্রেশন হবে আইনমতো। ওর কথা বিশ্বাস করলুম। দারুণ অভিনয় করে যাচ্ছিল। একটুও ধরতে পারিনি।

রাণু বালিশে কনুই রেখে মাথা তুলে বলল, কিন্তু ওর স্ত্রী ছেলেমেয়ে আছে কীভাবে জানলে?

চৈতালী হাসবার চেষ্টা করে বলল, পরে খুঁজে খুঁজে বের করছিলুম। তখন বলে কী জানো? আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারছিনে!

তারপর?

অপমানিত হয়ে চলে এলুম। সেই শেষ।

তুমি ওকে ভুলতে পারো নি—তাই না চৈতালী?

চৈতালী চুপ করে থাকল।

চৈতালী।

চৈতালী ঘুরে রাণুর বুকের কাছে মুখ গুঁজে বলল, নিজের মনের কাছে আমি হেরে যাই রাণুদি। প্রতারক ভণ্ড বলে যাকে ঘৃণা করি, তার কাছে···

চৈতালী চুপ করে গেল। রাণু তার গায়ে হাত রেখে বলল, হয়তো ভালবাসার নিয়ম এই। কে জানে!

কতক্ষণ পরে চৈতালী আবার চিত হয়ে শুল। বলল, রাণুদি, তুমি কখনও কাউকে ভালবাস নি?

রাণু অন্ধকারে হাসল।···আমি মুসলমানের মেয়ে। পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশায় বাধা আছে জানো না? সুযোগ পেলে তো ভালবাসব কাউকে!

চৈতালী বলল, মিথ্যা।

কেন মিথ্যা?

যেদিন থেকে দেখছি, সেদিন থেকে মনে হয়, তোমার মধ্যে আমারই মতো কী একটা লুকানো দুঃখ আছে।

তাই বুঝি?

চৈতালী আদুরে গলায় বলল, বলো না রাণুদি তোমার কথা!

রাণু শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, যাঃ! আমার কিছু ঘটেনি। ঘটলে তো বলব।

তাহলে তোমাকে অমন দেখায় কেন?

কিছু দেখায় না। তোমার চোখের ভুল।···একটু চুপ করে থাকার পর রাণু ফের বলল, মানুষের কি শুধু ভালবাসায় দুঃখ থাকে চৈতালী? ভালবাসতে না পারার দুঃখও কি থাকে না? ধরো, তোমার জীবনে কেউ এল—যাকে দেখে তোমার মনের ভেতর ঝড় বইতে লাগল। ওলটপালট ঘটে গেল। অথচ তুমি সব নিষ্ঠুরভাবে চেপে রাখলে। তোমার সাহস হল না। তুমি পিছিয়ে এলে। এই যে পিছিয়ে আমার দুঃখ, এটাও কি কম চৈতালী?

কেন পিছিয়ে এলে রাণুদি?

ধরো এমন যদি হয়, তার দুটো অস্তিত্ব ধরা পড়ল তোমার কাছে। একটা অস্তিত্ব প্রেমিকের—গুণী রূপবান এক পুরুষের, যাকে তোমার ভালবাসতে ইচ্ছে করল। অপর অস্তিত্ব এক ভণ্ড, প্রতারক, বাউণ্ডুলে অসাধারণ এক কদর্য মানুষের। তাহলে ?

তাহলে তো আমারই কেন, রাণুদি। চৈতালী একটু হাসল।

তফাত আছে। রাণু শান্তভাবে বলল। তুমি তোমার প্রেমিকের অপর অস্তিত্বের কথা জানতে না। জানলে কি পিছিয়ে আসতে না চৈতালী ?

কে জানে।

রাণু বালিশ থেকে কনুই তুলে চিত হয়ে শুল ফের। বলল, শুনেছি—ভালবাসা একটা ব্লাইণ্ড ফোর্স। তবু কেউ কেউ তার টানে ভেসে যেতে পারে না। হয়তো তার মনের গড়নটাই আলাদা। কিন্তু পরে পাথরে মাথা কোটার মতো নিজের শক্ত মনটার ওপর মাথা ভাঙতে হয় সারাজীবন।

চৈতালী রাণুর গায়ের ওপর হাত রেখে টানল। ঘন হয়ে বলল, আবার বৃষ্টি এল, শোনো।

আবার বৃষ্টি এল ঝমঝমিয়ে। রাণু মশারির বাইরে হাত বাড়িয়ে ছাঁট পরখ করে বলল, কাল নির্ঘাত রেনিডে। রেনিডে হলে তুমি কিন্তু থাকছ আমার কাছে। নাজুকে দিয়ে খবর পাঠাব মাধবীদিকে।

নাজু কে গো ?

আমার ভাই। রাণু হাসল হঠাৎ। এই, জানো ? নাজু একটা মেয়ের সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করছে। তাকে বিয়ে করবে বলে পাঁয়তারা করছে সবসময়। ও ট্রাক চালায় তো পারুল ট্রান্সপোর্ট কোম্পানিতে—বেশি লেখাপড়া শেখেনি। দারুণ মারকুটে মস্তান-টাইপ ছেলে। তো—ওর প্রেমিকাটি এক জুয়াড়ির মেয়ে। মোটেও লেখাপড়া জানে না। তবে নাকি অসম্ভব রূপসী। আমি অবশ্য দেখিনি এখনও।

রাণু নাজিমের গল্প করতে থাকল। শেষে বলল, কিন্তু তাই বলে ভেব না এতে আমার সায় আছে। জুয়াড়ির মেয়ে নিয়ে ও যেদিন ঢুকবে, সেদিন আমি বেরিয়ে যাব। কেন জানো? কালচার বলে একটা ব্যাপার আছে না? তাছাড়া ভাই হলে কী হবে? নাজুটা একের নম্বর ইতর। পাকা কিলার। কিলারকে কে পছন্দ করে বলো চৈতালী?

চৈতালী গভীর ঘুমে ঢলে পড়েছে। রাণু চুপ করল। বৃষ্টির শব্দ শুনতে থাকল।···

দশ

শ্রাবণে ঝুলন পূর্ণিমার দিন কুতুবগঞ্জে মেলা বসে। গঙ্গার পাড় থেকে পাটোয়ারিণীর গদীর পাশ দিয়ে এঁকেবেঁকে মেলাটা চলে যায় রেললাইনের ধারে-ধারে কতদূর। রামমন্দিরে অষ্টপ্রহর সংকীর্তনের আসর বসে। মানুষের ভিড়ে এ দিনটা পথ চলা কঠিন। তার ওপর ঝিরঝিরিয়ে যখন-তখন বৃষ্টি। আকাশ মেঘে ঢাকা। তার মধ্যে খুব ঘটা করে স্কুলের বারান্দায় পত্রিকা-প্রকাশের অনুষ্ঠান হল।

ব্রততীর বাবা রসময়বাবুর সারদা প্রেসের ট্রেডল মেসিনে যেমন-তেমন করে ছাপানো। তবু কত আনন্দ মেয়েদের। রাণুর মনে সেই আনন্দ প্রতিধ্বনিত। সপ্রতিভ, চঞ্চল, মুখে ঈষৎ গাম্ভীর্যও—আবার কখনও উজ্জ্বল হাসি। অনুষ্ঠানে কবিতাপাঠ, বক্তৃতা, একটু নাচ-গানেরও আয়োজন ছিল।

বিকেলে বৃষ্টিটা একটু ধরেছে। ঝুলনের মেলা বলে ভিড়টাও বেড়ে গেছে। স্কুলের প্রাঙ্গণ থই থই করছে। সেই ভিড় ঠেলে মাথায় টাকা নিয়ে মোজাম্মেল হোসেনকে আসতে দেখে রাণু একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল। রাণুর পাশ দিয়ে যাবার সময় চোখে চোখ পড়লে একটু কাঁচুমাচু মুখে হাসল সে। রাণু সরে গেল।

মোজাম্মেল জয়ন্তীর কাছে গিয়ে কথা বলতে থাকল।

রাণুর সব আনন্দ মাঠে মারা গেল। ভদ্রলোককে কি ডাকা হয়েছিল অনুষ্ঠানে? রাণু জানে না। জয়ন্তীর নির্দেশে আমন্ত্রণ-কার্ড পাঠিয়েছে চৈতালী। একটু পরে সে দেখল মোজাম্মেল কবিতা পড়ছে মাইকের সামনে। রাণু আরও দূরে সরে গেল। লাইব্রেরি ঘরে মেয়েরা নাচের জন্য সাজছিল। সে সেখানে গিয়ে দাঁড়াল।

মাঝে মাঝে তার ডাক আসছিল। রাণু বিরক্ত হয়ে বলল, দেখতে পাচ্ছ না এদের সাজাচ্ছি? বড়দিকে বলো, যাচ্ছি।

বেলা পড়ে এলে নীচের মেয়েরা যখন বারান্দার স্টেজের দিকে এগোল, তখনও রাণু একা দাঁড়িয়ে আছে থামের আড়ালে। একটা চাপা ভয় অথবা অস্বস্তি তাকে পেয়ে বসেছিল। বড়দি রাগ করবেন সে জানে। তবু ইসলামপুর কলেজের লেকচারার ভদ্র-লোকের সামনে যেতে তার ইচ্ছে করছিল না।

কিছুক্ষণ পরে রাণু দেখল, জয়ন্তী মোজাম্মেলের সঙ্গে কথা বলতে বলতে এদিকেই আসছেন। অমনি পাগলামি ভর করল রাণুর মাথায়। সে থামের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। জয়ন্তী অফিসের তালা খুলে ভেতরে ঢুকলেন। মোজাম্মেলও ঢুকল। তাখন রাণু সোজা বারান্দা দিয়ে হেঁটে স্টেজের কাছে এল।

চৈতালী প্রোগ্রামের কাগজ হাতে একপাশে দাঁড়িয়ে নাচ দেখছিল। রাণুকে দেখে কাছে এসে বলল, ছিলে কোথায় বলো তো? কখন থেকে খুঁজছি।

রাণু অপ্রতিভ ভংগিতে একটু হাসল।...মাথাটা একটু ধরেছে। তাই ফাঁকায় নিয়ে দাঁড়িয়েছিলুম।

শোনো, তোমায় এক ভদ্রমহিলা খুঁজছিলেন। দাঁড়াও, কোথায় আছেন দেখি। বলে চৈতালী ওপাশে মহিলাদের ভিড়ের দিকে চঞ্চল চোখে তাকাল। তারপর এগিয়ে গিয়ে কাকে বলল, এই যে! শুনছেন? রাণুদিকে খুঁজছিলেন না?

রাণু দেখল, গুণমালা উঠে আসছে ভিড় থেকে। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখটা আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

গুণমালা চোখ পাকিয়ে বলল, তোকে বলেছিলুম না ঝুলন পূর্ণিমায় আসব? সেই সকাল থেকে তোর জন্য ঘরবার করছিলুম জানিস? শেষে কী করব, তোদের ফাংশনে খুঁজতে এলুম। কিন্তু তাও মেয়ের পাত্তা নেই। খুব কাজের লোক হয়েছিস, না?

রাণু ওকে জড়িয়ে ধরে নিচে প্রাঙ্গণে নেমে গেল। যাবার সময় চৈতালীকে বলে গেল, ম্যানেজ করবে, চৈতালী! আমি কাট করলুম। বড়দিকে বোলো, ভীষণ মাথা ধরেছে। জ্বর এসে যাবে।

চৈতালী কিছু বলল। শুনতে পেল না রাণু। কাঞ্চন ফুলের গাছটার পাশ দিয়ে এগিয়ে সে গেটে গেল। বলল, খুব বাঁচিয়ে দিয়েছিস গুণ। একটু হলেই প্রাণটা যেতে বসেছিল রে!

রাণু হাসছিল। গুণমালা সন্দিগ্ধ ভংগিতে বলল, কী ব্যাপার?

রাণু চোখ নাচিয়ে মুখে দুষ্টুমি ফুটিয়ে বলল, ইসলামপুরের সেই টাকওয়ালা ভদ্রলোক এসে জুটেছে।

বলিস কী? গুণমালা হেসে উঠল। তবে যে শুনেছিলুম ন্যাড়া বেলতলায় দুবার যায় না!

লোকটা বড্ড নির্লজ্জ। বলে রাণু তার হাত ধরে টানল। আয়, মেলায় ঘুরি গে। কতকাল আমরা ঝুলন দেখিনি রে একসঙ্গে!

বাজে কথা বলিসনি রাণু! গুণমালা ওর পিঠে ছোট্ট কিল মারল। গত ঝুলনে আমরা যাত্রা শুনেছিলুম।

রাণু আনমনে বলল, আর রথের মেলায় ভাগে টিয়া কিনেছিলুম। কী হয়েছিল রে সে-পাখিটার?

বেড়ালে খেয়েছিল।

গলিপথে আলো নেই। কিন্তু লোক চলাচল আছে। বড় রাস্তায় এগিয়ে ওরা মেলায় ঢুকল। আলো জ্বলে উঠেছে। নাট-মন্দিরের দিকে সংকীর্তন শোনা যাচ্ছে মাইকে। গুণমালা বলল,

রাণু, সেই ভদ্রলোক—সেই কী যেন নাম—মিমিক্রি করেছিলেন, তার খবর কী বল্ তো ?

রাণু আস্তে বলল, আমি কেমন করে জানব ? তার বুকটা ধড়াস করে উঠেছিল।

গুণমালা বলল, বা রে ! তোদের বাড়িই তো ছিলেন !

রাণু বলল, নাজিমের ব্যাপার। আমি ওসব খবর রাখি না।

ঝুলনের মেলায় ওঁর আসা উচিত ছিল। এলে দারুণ জমত। কী বলিস ? দারুণ গানও গাইতে পারেন। তাই না ? গুণমালা রাণুর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল রাণু গম্ভীর। বলল, মুখটা হঠাৎ বিটকেল বুড়ির মতো করে ফেললি কেন রে ?

রাণু নার্ভাস ভংগিতে হাসল। যাঃ ! ও কিছু না।

পাঁপরভাজা খাবি রাণু ?

ভ্যাট্ ! লোকে কী ভাববে !

আমরা পাঁপরভাজা খাব—লোকে কী ভাববে মানে ? বলে গুণমালা চোখ নাচালো। ও, বুঝেছি ! স্কুলের জাঁদরেল দিদিমণিকে এখানে পাঁপরভাজা খেতে দেখলে স্টুডেন্টরা প্যাঁক দেবে !

রাণু পাঁপরের দোকানের দিকে পা বাড়াল। ক্রমশ গুণমালার বালিকাপনা আর বেপরোয়ামি তারও বয়স কমিয়ে দিচ্ছিল। নিঃসঙ্কোচে পাঁপরভাজা খেতে খেতে ওরা নাটমন্দিরের সামনে দিয়ে গঙ্গার ধারে গেল। এখানটায় ঘাট। অজস্র নৌকো আর লোকের ভিড়। তার মধ্যে স্নান করতেও নেমেছে অনেকে। সামনে ভরা গঙ্গার ওপারে মেঘ হলুদ হয়ে আছে। তারপর মেঘের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল পূর্ণিমার ঝলমলে চাঁদ। জ্যোৎস্না ছড়াতে থাকল জলের ওপর। আবার মেঘ এসে ঢাকল। বড় দ্রুতগামী মেঘ সব। বারবার জ্যোৎস্না আর হলুদবর্ণ অন্ধকারের খেলা চলতে থাকল বিশাল জলের ওপর।

পাঁপর শেষ করে ব্যাগ খুলে রুমাল বের করল রাণু। মুখ মুছে

বলল, আরও খেতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু থাক্। বড্ড অস্বস্তি হচ্ছে জানিস ?

কিসের অস্বস্তি ?

বড়দিকে বলে এলুম না। ভীষণ রাগ করবেন।

কাল সকালে দুজনে গিয়ে হাজির হব। বলব, আমিই আপনার রাণুকে এলোপ করেছিলুম।...গুণমালা চাপা গলায় ফের বলল, আচ্ছা রাণু, ধর্ আমি যদি ছেলে হতুম, আমাকে ভালবাসতিস ?

ভীষণ, ভীষণ। রাণু ওর পাঁজরে আঙুলের খোঁচা মারল। কিন্তু আমি যদি ছেলে হতুম, তুই নিশ্চয়...বলেই সে জিভ কাটল। ...সরি, ভুলে গিয়েছিলাম।

গুণমালা বুঝল, রাণু মোয়াজ্জেমের কথা তুলতে যাচ্ছিল। সে প্রসঙ্গ বদলাল।...কেমন শীতশীত করছে। বৃষ্টি এসে গেলে বিপদ। আয়, নাটমন্দিরে কী হচ্ছে দেখি গে। তারপর রাসমন্দিরে ঝুলন দেখতে ঢুকব।

রাণু বলল, আমাকে ঢুকতে দেবে না জানিস তো ?

গুণমালা থমকে গেল। হ্যাঁ—তাই তো। থাক্। নাটমন্দিরে কী হবে দেখে যাই। যাত্রা-টাত্রা হলে আসব। তুই ঝটপট খেয়ে-দেয়ে রিকশো করে আমাদের বাড়িতে চলে আসবি।

নাটমন্দিরে অন্য প্রোগ্রাম নেই। অষ্টপ্রহর সংকীর্তন। কলকাতার যাত্রা বায়না নেয়নি। স্থানীয় যাত্রাদল পাটোয়ারীজীর গদীর সামনে আসর করবে। সামিয়ানা খাটানো হচ্ছে। পাটোয়ারীজী গদীর সামনে চেয়ারে বসে লোকের সঙ্গে কথা বলছেন। গুণমালা বাবার দৃষ্টি এড়িয়ে রাণুর হাত ধরে ফের মেলার ভিড়ে ঢুকল।

পাঁপর ভাজার গন্ধ, ভেঁপু বাঁশির সুর, চানাচুরওয়ালার সঙের গান, ম্যাজিকের ছোট্ট তাঁবুতে ড্রামের বাজনা, ভিড়ের গম গম কল কল কোলাহল আর নাটমন্দিরের দিক থেকে ভেসে আসা মাইকে কীর্তনের কলি—এসবের মধ্যে গুণমালা রাণুকে তার হারানো ছোটবেলাটা ফিরিয়ে দিচ্ছিল।

গুণমালা এসে তাকে এমনি করে ছোটবেলাটা ফিরিয়ে দিয়ে যায়। কৃতজ্ঞতায় ভালবাসায় ভিড়ের ভেতর গুণমালার হাতটা শক্ত করে ধরে রইল রাণু।···

এরাতে রাণু কী এক গভীর সুখে আবিষ্টা। স্কুলের জীবনটাকে সামান্য একটা পত্রিকা এমন নতুন করে তুলবে, সে অত বোঝেনি। শুধু ওই বেহায়া টাকওয়ালা অধ্যাপকটি না এসে পড়লে কত ভাল হত। জয়ন্তীকে কি আবার সাধাসাধি করে গেছে বিয়ের জন্য? মনে হয়, সে সাহস হবে না। বড়দি বড় কড়াধাতের মহিলা। উল্টে ধমক খাবে।

অনেক রাতে বাগানে হঠাৎ জ্যোৎস্না ফুটল কিছুক্ষণ। মশারির ভেতর দিয়ে জানলার দিকে তাকাল রাণু। মশারির পর্দা কুয়াশার মতো উজ্জ্বল আকাশ-ধোয়া জ্যোৎস্নাকে ঢেকেছে। তার ভেতর তার বাগানটা কালো হয়ে আছে। পোকামাকড় ডাকছে গভীরতর কোলাহলে। ক্রমশঃ রজনীগন্ধার গন্ধ আসছে ঘরের ভেতর। চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ রাণুর মনে হল, নিজেকে ব্যর্থ বা বঞ্চিতা ভাববার কী কারণ আছে তার? তখন সে উঠে বসল।

কেরোসিন বাতি জ্বেলে টেবিলের সামনে বসে বুলিকে চিঠি লিখতে থাকল।

···বুলি, আমার গতমাসে লেখা চিঠিটার জবাব এখনও পাই-নি। হয়তো লিখেছিস, ডাকের গণ্ডগোলে পৌঁছতে দেরী করছে। তবে শাহাবুদ্দিনের একটা চিঠি পেয়েছি। ওকে বলিস, ইচ্ছে করেই তার জবাব দিচ্ছি না। আচ্ছা বুলি, তোর বরকে একটু শাসন করবি তো! সম্মানিতা জ্যেষ্ঠ শ্যালিকাকে কীভাবে চিঠি লিখতে হয়, এ আদব-কায়দা কি ও এতদিনেও শিখল না? না—রাগ করে লিখছি না। ওর এবারকার চিঠিটা পেয়ে খুব হেসেছি, জানিস? আমাকেও ও মরীচিকা দেখাচ্ছে আরবের মরুভূমির। আমি এই সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বাংলায় বসেই কত না মরীচিকা দেখলুম

এতকাল।···এখন রাত এখানে প্রায় বারোটা। এ মাসটা রোজই বৃষ্টি হচ্ছে। আজ বিকেল থেকে বৃষ্টি নেই। কিন্তু খুব মেঘ জমে আছে আকাশে। মেঘগুলো স্থির থাকছে না। ভেসে বেড়াচ্ছে। তাই অনেক ভাগ্যে এরাতে ঝুলন পূর্ণিমার দিন চাঁদটা দেখা হয়ে গেল। এখন তোকে লিখতে লিখতে দেখছি, বৃষ্টিধোয়া জ্যোৎস্নায় আমার সেই বাগানটা ঝলমল করছে। সুখে অহঙ্কারে আমার মনটা এত ভরে গেল বুলি, যে, বিছানা ছেড়ে তোকে চিঠি লিখতে বসলুম।

·· শ্রাবণের ঝুলন পূর্ণিমা শুনে তোর মনটা কি নেচে উঠছে না বুলি? আগের বছর আমরা রিকশো নিয়ে গঙ্গায় নৌকো ভাড়া করে কতদূর গিয়েছিলুম মনে পড়ছে? সন্ধ্যার পর হঠাৎ বৃষ্টিটা ছেড়ে আকাশ একেবাবে সাফ হয়ে গিয়েছিল। তুখিয়া মাঝির নৌকোটা বেশ বড় ছিল। আমরা অতগুলো মেয়ে—তার সঙ্গে চণ্ডীদা, নাজিম আর একটা গাইয়ে ছেলে। নাম ভুলে গেছি তার। মোয়াজ্জেমকে নিতে চেয়েছিল নাজিম। আমার আপত্তিতে নিতে পারেনি। গুণমালা ছিল বলে। আমার এখনও চোখে ভাসছে ওপারে জ্যোৎস্নায় বাবলা গাছের বন, কাশে ঢাকা পঞ্চমুণ্ডীর মাঠ, মাঠের মধ্যে সেই গম্বুজঘরটা। চণ্ডীদা গান গাইল। অমরবাবুর চেয়ে ভাল গায়। শেষে তুই গাইলি। কী যেন গেয়েছিলি মনে নেই— কী রে গানটা?

· আজ সন্ধ্যার পর মেঘের ফাঁকে চাঁদ উঠল। বিশাল সোনার থালার মতো আশ্চর্য সেই পুরনো চাঁদটাই, বুলি! তখন আমি আর গুণমালা ঘাটের মাথায় দাঁড়িয়ে আছি। আগে যদি জানতুম গুণ এসেছে বাপের বাড়ি, তাহলে নৌকো ভাড়া করে বেরিয়ে পড়তাম। চুপি চুপি বলি শোন, গুণমালা মা হতে চলেছে। অথচ এমন করে বলল কথাটা, যেন ওটা তার কাছে কোনো ব্যাপারই নয়। আমি খুব অবাক হয়ে ওকে দেখছিলুম। তবু এত স্বাভাবিক আছে কী করে ভেবেই পাচ্ছিলুম না। আমি হলে তো ভয়ে কাঠ হয়ে

থাকতুম। আসলে গুণ বরাবর বড় শক্ত মনের মেয়ে। বলল কি জানিস? 'আমি কি তোদের মতো রোগাপটকা ক্ষীণজীবী বাঙালিনী? এ হল রাজস্থানী শরীর—দুধ-মাখন-ঘি-ফল খাওয়া।'

···আজ আরও একটা বড় সুখের দিন গেল জীবনে। তোকে স্কুল ম্যাগাজিনের কথা বলা হয়নি আগের চিঠিতে। আমাদের পত্রিকা আজ ছেপে বেরুল। ব্রততীদের প্রেসে ছাপা। বড় বাজে ছেপেছে। তবে স্কুলের জীবনে যেমন, আমাদের টিচার আর ছাত্রীদের জীবনেও ভারি নতুন ঘটনা। বিকেলে ফাংশন মতো হল। বৃষ্টির ভয়ে বাইরে প্যাণ্ডেল করা যায়নি। ফাণ্ডের পয়সাকড়িও ছিল না। বারান্দায় স্টেজ মতো করেছিলুম শাড়ি-চাদব টাঙিয়ে। মেলার সময় বলে বাইরের লোকের বড্ড ভিড় হয়েছিল। ওরা তো পত্রিকা বোঝে না—গান শুনতে এসেছিল। কিন্তু এমন একটা দিনে বুঝতেই পারছিস, তোর অভাব কী তীব্র হয়ে বুকে বাজে বোঝাতে পারব না। তুই থাকলে লোকে অসংখ্য গান গাইয়ে ছাড়ত। আরও কত জমত বল্!···

রাণু কলম তুলে ভাবতে লাগল কিছুক্ষণ। আব্বার চিঠিতে অধ্যাপক ভদ্রলোকের ব্যাপারটা শুনেছে বুলি। শাহাবুদ্দিনের চিঠিতে তার আভাস্ আছে। কিন্তু আব্বা, মা, নাজিম বা বুলিরা জানে না, রাণুই বিয়েটা চিঠি পাঠিয়ে ভণ্ডুল করে দিয়েছিল!

আজ ফাংশনে মোজাম্মেলের নির্লজ্জের মতো আবার আমার কথাটা বুলিকে লিখতে পারলে মজা পেত—তৃপ্তিও হত। কিন্তু থাক্, রাণু রহস্যটা ফাঁস করবে না। সে ঠোঁট কামড়ে আবার কাগজে ঝুঁকে গেল।

·· তুই এখন খুব স্মার্ট হয়ে গেছিস মেমসায়েবদের মতো, তাই না? খুব ইংরেজি বুলি ঝেড়ে বেড়াচ্ছিস! কী একটা চাকরির কথা লিখেছে তোর বর। সত্যি করবি নাকি? যতই বল্, লোকেরা তো মনে-মনে জংলী। নইলে এখনও অপরাধীদের পাথর ছুড়ে মেরে ফেলার আইন কেন? মাঝে মাঝে কাগজে মেয়েদের রেপ

করে মেরে ফেলার ঘটনা শুনি। এমন ঘটনা সবখানেই আজকাল ঘটছে। সাবধানে চলাফেরা করিস। তুই বড্ড চঞ্চল আর গোঁয়ার মেয়ে বলেই ভাবনা হয়।···

ইচ্ছে করেই বুলিকে আরও কিছু ভয় দেখিয়ে সাবধান করে চিঠিটা শেষ করল রাণু। ভাঁজ করে প্যাডের ভেতর রেখে আরও কিছুক্ষণ বসে রইল।

তারপর তার অবাক লাগল, কেন রাতদুপুরে বিছানা ছেড়ে বুলিকে এতবড় একটা চিঠি লিখে ফেলল সে? সেও যে কম সুখে নেই, এটাই ছোট বোনকে জানাতেই কি এত অস্থিরতা?

প্যাড থেকে চিঠিটা বের করে ভাঁজ খুলল রাণু। আবার খুঁটিয়ে পড়ল। ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠল তার। মনে হল, যথেষ্ট বলা হয়নি। আরও বলা দরকার। সে মার্জিনের জায়গাগুলো ভরতে থাকল তার ফুল-ফলের ছোট্ট বাগানটার কথায়। এ শ্রাবণে তার রজনীগন্ধার যৌবনের খবর বুলিকে জানানো দরকার। গোলাপ, শাদা জবা, কামিনী, হাস্নুহেনা, দোপাটি, ভুঁইচাপার হাট বসিয়েছে রাণু। রোপণ করেছে লাউ, শশা, শিম। মাচানে লতিয়ে উঠেছে সবে। ক্যাকটাসের হলুদ কাঁটা ঝলমলিয়ে উঠেছে বেদনার তীক্ষ্ণতা জানাতে। রাণু এখন মালিনীর মতো তার সুখের বাগানে বসে দুহাত ভরে মাটির গন্ধ মাখে। ঘাসফড়িং প্রজাপতি লালপোকা নীলপোকাদের দিকে সস্নেহে তাকিয়ে থাকে।

শেষ মার্জিনে রাণু 'সন্ধ্যানীড়' ফলক আঁটা পুরনো দেউড়ির মাথায় দাদীবুড়ি কাঠমল্লিকার খবরও লিখল। তারপর হাই তুলে শুতে গেল।··

ভোর ছটায় তিনটি মেয়ে পড়তে আসে। আটটায় তারা চলে যায়। তখন রাণু স্কুলের জন্য তৈরি হতে থাকে। আগে এত তাড়াহুড়ো ছিল না তার। ধীরে সুস্থে তৈরী হত নটার পর। সালামের রিকশো বাঁধা ছিল আসতে-যেতে। এখন পায়ে হেঁটেই

যায়। স্নান করে বাগানটা একবার ঘুরে আসে সে। ময়নার মাকে ডেকে সতর্ক থাকতে বলে। নটার মধ্যে খেয়ে বেরিয়ে পড়ে।

বাগানে বেড়ার কাছে রাণু দাঁড়িয়ে আছে, ভিজে চুলে তখনও চিরুনি দেয়নি—একটু রোদ ফুটেছে আজ। নাজিম খিড়কির দরজায় বেরিয়ে কাছে এল। সন্ত ঘুম থেকে উঠেছে। মুখটা ফুলো-ফুলো ঠেকছে। চোখদুটো লাল—ঈষৎ কোটরগত।

রাণু তাকে দেখে বলল, কী রে ? ঘুম ভাঙল ?

নাজিম বাসি মুখে থুথু ফেলে বলল, শোন আপা, কথা আছে। খুব প্রাইভেট।

রাণু হাসল।···আবার কাকে কোতল করেছিস বুঝি ? উল্টে তোকে যে কবে কোতল করবে, সেই দিন গুণছি।

নাজিম হাসল না। গলার ভেতর বলল, অনেক রাতে ফিরে তোর জানলায় গিয়ে ডাকব ভাবলুম, তুই কী লিখছিলি দেখে বিরক্ত করলাম না। তাছাড়া হঠাৎ মনে হল, কী খামোকা ঝুট-ঝামেলা করি রাতদুপুরে।

রাণু সন্দিগ্ধভাবে বলল, কী ব্যাপার রে ?

নাজিম কেমন একটু হাসল।···ইচ্ছে ছিল, যেদিন বিয়ে করব, বাড়িতে ইলেকটিরি জেলে করব। আজই ভাবছি ইলেকটিরি অফিসে যাই জগুকে সঙ্গে নিয়ে। ওর সঙ্গে ভাব আছে। ঝটপট লাইন দিয়ে দেবে।

রাণুর অস্বস্তি কেটে গেল। কিন্তু ভুরু কুঁচকে কপট গাম্ভীর্যে বলল, আচ্ছা! তাহলে সত্যি বিয়ে করছিস সেই মেয়েটাকে ? দেখ নাজু—তোকে অনেকদিন থেকে বলব-বলব ভাবছি, তুই···

কথা কেড়ে নাজিম ঝাঁঝালো স্বরে বলল, কথাটা শোন আগে। তারপর মাস্টারনীগিরি ফলাস্।

রাণু তাকিয়ে রইল।

নাজিমের নাসারন্ধ্র কাঁপছিল। হিসহিস করে বলল, আমি খানবাহাদুরের নাতি। আমারও একটা ইজ্জত আছে ছোটখাটো।

কাল ঝুলনের মেলায় দেখি, স্বভাব মলে যায় না—বুঝলি আপা? কাশেমশালা ফের জুয়োর ছক নিয়ে এসেছে।

রাণু একটু হাসল এবার।…জুয়াড়ি জুয়ো খেলতে আসবে। এ আর নতুন কথা কী?

নাজিম গর্জন করল।…তবে যে শালা কোরান ছুঁয়ে মসজিদে মৌলবির কাছে কিরে করে বলেছিল, এই জুয়ো ছাড়লুম?

রাণু ভাইয়ের ছেলেমানুষি দেখে হাসতে লাগল।

নাজিম বলল, হাসিসনে আপা। কাল রাত থেকে মাথায় খুন চড়ে আছে। মাথার ঠিক নেই।

তোর তো সবসময় মাথায় খুন চড়ে থাকে। রাণু পা বাড়াল। ভাগ্! স্কুলের সময় হয়ে এল।

নাজিম গলা চেপে শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, আসল কথাটা শোন না আপা! জীবনে—এতবড়টা হলুম, এমন করে দাগা কেউ দিতে পারেনি এ নাজুকে। কাল রাতে জুয়োর ছকে বাপের পাশে হারামজাদী ছেনালটাকে দেখলুম—জানিস?

রাণু তাকাল ওর মুখের দিকে।

দেখলুম। দেখে আমার—তোকে কী বলব আপা, এ নাজুকে দেখছিস এ্যাট্টুকুন থেকে—সেই নাজুর শরীরটা অবশ হয়ে গেল। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলুম না।…নাজিমের চোখ ফেটে জল এসে গেছে। সে মুখ ঘুরিয়ে নিল। তার ফর্সা কান আর গাল রোদে ভীষণ লাল দেখাল। সে ধরা গলায় ফের বলল, মুন্নী জুয়োর ফড়ে (কৌটো) গুটি ভরে চলেছে, আর দান ধরেছে শালার ব্যাটা শালা মোয়াজ্জেম। আপা, আমি তখনই দুটো জান নিতে পারতুম। আমার প্যান্টের পকেটে ড্যাগার থাকে। কিন্তু আমার মনটা ভেঙে গেল আপা! উঁকি মেরে দেখে পালিয়ে এলুম।

নাজিমের কাঁধে রাণু হাত রাখতেই সে জোরে কেঁদে মুখটা দিদির বুকে গুঁজে দিল। রাণু ব্যস্তভাবে বলল, ছি ছি! তুই

ছেলে, না মেয়ে রে? লজ্জা করে না কাঁদতে? বাঁদর কোথাকার! একটা অশিক্ষিত ছোটলোক জুয়াড়ির মেয়ে—মেলায় ঘোরা প্রস, তার জন্যে তুই কাঁদতে এসেছিস? থাপ্পড় খাবি বলছি!

সে তার যুবক ভাইয়ের চোখ দুটো মুছিয়ে দিল। নাজিম মুখ নিচু করে ডোবার পাড়ে আগাছার জঙ্গলে ঢুকল। রাণু অস্বস্তিতে ছটফট করে উঠল। নির্বোধ গোঁয়ার আর ভাবপ্রবণ বরাবর। ঝোঁকের মুখে রেললাইনে ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দেবে না তো? রাণু ডাকল, নাজু! নাজু! কোথায় যাচ্ছিস এমন করে?

নাজিম হনহন করে হেঁটে যাচ্ছিল। খিড়কির দরজায় মুখ বের করে সাবধানী গলায় ময়নাব মা বলল, কী হয়েছে গো নাজুর?

রাণু তেড়ে গেল। কী হবে? কিছু হয়নি। তোমার সব তাতে নাক গলান চাই!

ময়নার মা বিরস মুখে বাড়ির ভেতর চলে গেল। রাণু কিছুক্ষণ অস্বস্তিতে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করল, নাজিম রেললাইন ডিঙিয়ে ওপাশে অদৃশ্য হল।

রাণু বাড়ি ঢুকল। রান্নাঘরের বারান্দায় গিয়ে বলল, মা! ভাত দাও।

কোনোরকমে তাড়াহুড়ো করে দুটো মুখে গুঁজে সে খিড়কির দরজা দিয়ে বেরুল। জোহরা জিগ্যেস করলেন, ওদিকে কোথায় যাচ্ছিস? রাণু বলল, স্কুলে।

যা ভেবেছিল তাই। বুড়িমাতলায় চুপচাপ বসে সিগারেট টানছে নাজিম। উস্কোখুস্কো বড় বড় চুল উড়ছে এলোমেলো গঙ্গার হাওয়ায়।· এই প্রাচীন বট কুতুবগঞ্জের কত বিষণ্ণ তাপিত মানুষকে সান্ত্বনা দিয়ে আসছে। রাণু জানে। রাণু নিজেও তো আজীবন দুঃখের দিনে এখানে বসে সান্ত্বনা নিয়ে গেছে।

রাণুকে দেখে নাজিম এবার একটু হাসল। রাণুর মনটা মমতায় ভরে গেল ভাইয়ের জন্য। কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে। কী বলবে ভেবে পেল না।

নাজিম আস্তে বলল, আবুধাবিতে দুলা ভাইয়ের কাছে আমার হয়ে একটা চিঠি লিখবি, আপা? চিঠি লেখা আমার আসে না।

রাণু বুঝতে পেরেও বলল, কেন?

তখন তো খুব লম্বাচওড়া বাত করে গেল দুলাভাই। এখন কাজের বেলায় কী করে দেখি।

তুই যাবি নাকি আবুধাবি?

যাই। নাজিম পায়ের কাছে একটা ঘাস ছিঁড়ে নিয়ে বলল। এ শালা ছোটলোকের দেশে মানুষ থাকে? খালি জুয়াড়ি আর ফোটোয়েন্টিতে ভর্তি।

রাণু হাসল।...তোর মতো বোকা গোঁয়ারদের কাছে সব দেশই ওই। চলতে না জানলে উঠোন বাঁকা।

তুই এম এ বি টি পাশ। তোর কথা আলাদা।...নাজিম মুখে ব্যাকুলতা ফুটিয়ে বলল। আজই লিখে ডাকে দিস না আপা! দুলাভাই বলেছিল, প্লেনের টিকিট পাঠাবে। সেটা ঝটপট পাঠাক। আর লিখবি, নাজুর মনে শান্তি নাই!

রাণু পা বাড়িয়ে বলল, মরুভূমিতে ট্রাক চালিয়ে শান্তি পাবি ভাবছিস?

কে জানে! দেখি তো গিয়ে। নাজিম উঠে দাঁড়াল। চল্, ঘাট হয়ে যাই। ভেবেছিলুম, আজ কাট্ মারব। সাঁইথে যাবার কথা ছিল দশটায়। কটা বাজল রে?

সাড়ে নটা।

চল্। একসঙ্গে যাই।...

ঘাটে গিয়ে রিকশো করল রাণু। স্কুলে পোঁছুলে চৈতালী বলল, কাল কী ব্যাপার রাণুদি? ওভাবে সব ফেলে চলে গেলে যে? বড়দি খুঁজছিলেন। যাও—গিয়ে বুকনি খেয়ে এস।

রাণু বলল, বড়দির বুকনি সারাজীবন খেয়েছি। তুমি বোধ হয় জানো না, আমি এই স্কুলে বড়দিরই ছাত্রী ছিলুম।

চৈতালী কপালে চোখ তুলে বলল, ওম্মা। বড়দির বয়স কত তাহলে ?

সে হিসেব কেউ জানে না। বলে রাণু জয়ন্তীর চেম্বারে ঢুকল।

জয়ন্তী মুখ তুলে বললেন, এই যে! কাল বেশ গা ঢাকা দিলে —এ্যাঁ? বসো।

রাণু বসে বলল, হঠাৎ মাথাটা ভীষণ ধরল এবং একটু···

হাত তুলে জয়ন্তী বললেন, জানি। তারপর হাসি চেপে টেবিলের কাগজপত্তরে চোখ রেখে ফের বললেন, আচ্ছা রাণু, তোমাদের মুসলিম সমাজে 'লগ্নভ্রষ্টা' বলে কোনো কথা আছে ?

রাণু বুঝতে না পেয়ে বলল, না তো। কেন বড়দি ?

নেই ? জয়ন্তী মুখ তুলে একটু হেসে বললেন।··হিন্দু সমাজে কথাটা আছে। লগ্নভ্রষ্টা কাকে বলে জানো ?

কেন জানব না ?

তুমি লগ্নভ্রষ্টা মেয়ে। তা জান তো ?

রাণু লজ্জিতভাবে হাসল।···আমি লগ্নভ্রষ্টা। কিন্তু স্বেচ্ছায়।

হুঁ, স্বেচ্ছায় লগ্নভ্রষ্টা যারা, তারা ডেঞ্জারাস মেয়ে।

একথা কেন বলছেন বড়দি ?

ওই দেখ, তুমি ভয় পাচ্ছ। জয়ন্তী হাসলেন। জাস্ট এ জোক! বলে একটু ঝুঁকে এসে সকৌতুকে ফিসফিস করে বললেন, রাণু, তোমার কোনো প্রেমিক নেই তো ?

রাণু রাঙা মুখ নামিয়ে বলল, না।

বলছি, কারণ সচরাচর স্বেচ্ছায় লগ্নভ্রষ্টাদের প্রেমিক থাকে। যাক্‌ গে, কাল তুমি চলে গেলে কেন, জানি। মোজাম্মেল বেচারা এসেছিল। আসলে ওর কবিতা পড়ার খুব নেশা। জয়ন্তী হাল্কা ভংগিতে বললেন। তোমাকে তো আগেও বলেছিলুম, যেখানে-যেখানে এ ধরনের ফাংশান হয়, ও বিনি নেমন্তন্নে গিয়ে হাজির হয়। বক্তৃতা করে। কবিতা পড়ে। বড্ড বাতিকগ্রস্ত ছেলেটি।·· জয়ন্তী আবার কাজে চোখ রাখলেন।

রাণু একটু ইতস্তত: করে প্রসঙ্গ বদলাতে চাইল।…বড়দি, পত্রিকার ছাপাটা বড্ড বাজে হয়েছে। বহরমপুরে কোন ভাল প্রেসে ছাপাবার ব্যবস্থা করা যায় না? খরচ একটু বেশী পড়বে হয় তো।

জয়ন্তী সেকথায় কান দিলেন না। বললেন, মোজাম্মেলকে দেখে তোমার চলে যাবার কারণ ছিল না। সে এখন খুব নিরাপদ প্রাণী, বুঝলে? কেন জিগ্যেস করছ না তো?

রাণু শুধু হাসল বিব্রতভাবে।

মোজাম্মেল সম্প্রতি বিয়ে করেছে। কাল ও বউকে নিয়েই এসেছিল ফাংশনে। রাত্রে আমার বাসায় থাকল। যেতে দিলুম না। জয়ন্তী কাজ শেষ করে দুহাতের আঙুলে আঙুল পড়ালেন। …বউটি বেশ ভাল। বি এ পার্ট টু দিয়েছিল। ফেল করেছিল। প্রাইভেটে আবার পরীক্ষা দেবে। বেশ মিষ্টি চেহারা। সকালে ওরা চলে গেল।

ঘণ্টা বেজে উঠল ঢঙ ঢঙ করে। রাণু বলল, ক্লাসে যাই বড়দি।

জয়ন্তী জবাব দিলেন না। কাঁচাপাকা চুলে আঙুল বোলাতে থাকলেন। জানলার দিকে দৃষ্টি। নিচু পাঁচিলের ওধারে রাস্তার পরে বর্ষার গঙ্গা দেখা যাচ্ছে। আকাশে ভাঙা মেঘ ভাসছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। রোদ আর ছায়া গঙ্গার বুকে। জয়ন্তী চাপা নিঃশ্বাস ফেললেন। রাণু কি তাঁরই প্রতিবিম্ব হয়ে উঠছে ক্রমশঃ?

রাণুর কানে কথাটা বাজছিল, সে লগ্নভ্রষ্টা। লগ্নভ্রষ্টা! কথাটা এভাবে তার মাথায় তো আসেনি এতদিন। এখন সারাক্ষণ কথাটা তার কানে বাজছে। মাথার ভেতর ঢুকে যাচ্ছে। শূন্য দৃষ্টে ক্লাসের দিকে তাকিয়ে রাণু বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছিল। মেয়েরা অবাক দৃষ্টে তাকিয়ে তাকে দেখছিল। মেজদির কী যেন হয়েছে।

স্কুলের সংলগ্ন খানিকটা সরকারী জমি আদায়ের জন্য বহুদিন থেকে তদ্বির চলছিল। পাটোয়ারীজী অব্দি কলকাতা ছোটাছুটি করেছেন।

তারপর জেলার সদরে এসে ফাইলে আটকে গেছে জমিটা। একবার ডি এম একবার ভূমি দফতর করে অবশেষে নাগালে এল। ও-মাসে জয়ন্তী পাটোয়ারীজীর সঙ্গে বহরমপুরে গিয়ে কিছুটা গুছিয়ে এনেছেন। এবার রাণুকে যেতে হল স্কুল ইন্সপেক্ট্রেস গায়ত্রী চ্যাটার্জীর কাছে।

বর্ষা কোথায় মিলিয়ে গেছে ভাদ্রের দিনে। আকাশ ঝকঝকে নীল। এতটুকু মেঘ নেই। গরমে আবহাওয়া গুমোট হয়ে রয়েছে। শরতে রোদটা অবশ্য তেজীই থাকে। দরদর করে ঘাম ঝরে।

মিসেস চ্যাটার্জীর কাছে কাজ শেষ করে রাণু যখন রাস্তায় নামল, তখন প্রায় আড়াইটে বেজে গেছে। বড়দির মতো তার ছাতিটিও কালো। ছাতির আড়ালে সে রাস্তার ধারে ঘাসের ওপর পা ফেলে আস্তে আস্তে হাঁটছিল। সঙ্গে চৈতালীকে আনলে সিনেমা দেখে সন্ধ্যার ট্রেনে ফিরত কুতুবগঞ্জে। একা ইচ্ছে করে না।

তবু অনেকদিন পরে এ শহরে এসে তার কলেজ-জীবনের কথা মনে পড়ছিল। চেনাজানা কারও কাছে কিছুক্ষণ কাটিয়ে যাবে কি না ভাবছিল রাণু।

হাইওয়ের মোড়ে আসতেই সে দারুণ চমকাল। খুব কাছে কোথাও ঘুঘুর ডাক।

রাণু থমকে দাঁড়াল। বিশাল শিরিষ গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রাজা মিয়া। হাত মুঠো করে ঘুঘু ডাকছিল তাকে দেখে। এখন মিটিমিটি হাসছে।

কিন্তু চেহারার সে জেল্লা একটুও নেই। প্যান্ট-শার্টও বেশ নোংরা। চোখের তলায় কালির ছোপ। নাকটা ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। চোয়ালের হাড় স্পষ্ট হয়েছে। মুখে খোঁচা-খোঁচা গোঁফ-দাড়ি। গায়ের রঙ কি এমন শ্যামলা ছিল রাজা মিয়ার ?

রাণুর মনে যে চেহারাটা আছে, তা এক উজ্জ্বল ফর্সা রঙের মানুষের। তার ভরাট গাল ছিল। চোয়াল ছিল না এমন। চোখ দুটো ছিল টানা-টানা। দৃষ্টিতে ছিল দূরের দেখা।

রাণু নিষ্পলক তাকিয়ে তাকে দেখছিল। তারপর তার সম্বিত ফিরে এল। সে পা বাড়াল।

রাজা মিয়া সামনে এসে দাঁড়াল।···চিনতে পারছ না রাণু বেগম? আমি সেই রাজা মিয়া। নৈলে কার এত হিম্মত যে এক ভদ্রমহিলাকে ঘুঘু ডেকে ভড়কি দেয়? সে খিকখিক করে হাসতে লাগল।

রাণু গম্ভীর মুখে বলল, ভাল আছেন?

ভাল নেই, সেটা কি দেখতে পাচ্ছ না রাণু বেগম? ইউ হ্যাভ ইওর আইজ। জাস্ট লুক! রাজা মিয়া কয়েক সেকেণ্ড নিজের দিকে আঙুল রেখে নিজেকে দেখাল।···ব্যাড লাক, রাণু বেগম! হঠাৎ কী হল, গলাটার মাথা খেলুম। সারা রাত কাশির জ্বালায় ঘুম হয় না। মিমিক্রি ওতরায় না। বড় জোর এই ঘুঘু! তাও দমে কুলোয় না। আমি খতম হয়ে গেছি রাণু বেগম।

রাণু আস্তে বলল, কোথায় আছেন এখন?

যেখানে দেখছ। রাস্তায়। রাজা মিয়া হাসল। রাতে মাথা গোঁজার একটা ডেরা আছে বাস টার্মিনালে একটা চায়ের দোকানে। বাট আই অ্যাম টোট্যালি ফিনিশড! খেল খতম বেগমসায়েবা।

রাণু বলল, আচ্ছা! চলি!

রাজা মিয়া বলল, এই সংসারের নিয়ম। যখন আমার গলা ছিল, নানারকম পার্টস ছিল—তখন আমার কদর ছিল। এখন কেউ পোঁছে না।

তার কথার ভংগিতে রাণু একটু বশ মানল।···না, না। আমাকে ট্রেন ধরতে হবে তো—তাই···

পরের ট্রেনে যাবে, রাণু। প্লীজ! রাজা মিয়া রাণুর চোখে চোখ রাখল।···জানো? একবার তোমার ভাই নাজুর সঙ্গে আমার মারামারি হয়েছিল! কী আশ্চর্য! নাজু মিয়া যে অমন ছেলে, আই কুড্'ন্ট ইমাজিন—রিয়্যালি!

রাণু একটু হাসল।···আপনি নাকি ওকে স্ট্যাব করতে ড্যাগার বের করেছিলেন?

আপন গড। খোদা সাক্ষী। ওটা কি ড্যাগার? গাছ-গাছড়ার ওষুধ বেচছিলুম। শেকড়বাকড় কাটার একটা ছুরি মাত্র। সেটা নিচে খবরের কাগজের ওপর রাখা ছিল।

সেটা দিয়ে বুঝি স্ট্যাব করা যায় না?

রাজামিয়া টের পেল রাণু তামাসা করছে। সে বলল, তা যায়। তবে আমি কিলার নই। লাইফে কখনও কাউকে আঘাত করিনি। পারিনি। আসলে আমি বড় ভীতু। কমজোর মানুষ রাণু। তবে ছুরি তোলাটা সত্যি। ঐ যে নেড়ী কুকুরটা যাচ্ছে, ওর লেজে টান দাও। খ্যাঁক করে কামড়াতে আসবে। আসবে না?

রাণু বলল, চলি।

রাণু, এক সকালে তুমি আমাকে নিয়ে ঘুরতে বেরিয়েছিলে মনে আছে?

রাণু মুখ নামিয়ে বলল, হুঁ।

সেই সকালটার মতো সকাল আমার জীবনে আর দুটো নেই, জানো? বিশ্বাস করো—

রাণু ব্যস্তভাবে পা বাড়াল।

রাজামিয়া তার পাশে হাঁটতে থাকল।...এখন ভাবি, সেই সকালে একটা দারুণ চান্স গেছে। তখন তোমাকে যা চাইতুম, দিতে। তোমার মুখে সে-কথা লেখা ছিল। রাণু, আমি ফিনিশড। কতবার ভেবেছি, তোমাকে এক চিঠি লিখি ·

কেন?

না—প্রেমপত্তর লেখার জন্য নয়। স্রেফ রুজির জন্য। আমি ফিনিশড রাণু। এখন শুধু পেট চালানোর জন্য একটা দরজা খোলা আছে। তা হল ম্যাজিক। কিন্তু পয়সার অভাবে মেটিরিয়্যালস কিনতে পারি না। অন্তত একশো-দেড়শো টাকা না হলে হয় না। আই ভেরি ব্যাডলি নিড ইট, রাণু।

রাণু দাঁড়াল।...টাকাগুলো যে মদে খরচ করবেন না, তার প্রমাণ কী?

রাজামিয়া গলার ভেতর বলল, আমাকে কি মদ খাওয়া লোক বলে মনে হয়? হয়েছিল রাণু?

রাণু জবাব দিল না। আবার হাঁটতে থাকল। সামনে বাসস্টপ। স্টেশনে যাবার বাস আসবে ওখানে।

রাজামিয়া কাকুতিমিনতি করতে থাকল, প্লীজ রাণু! আল্লার দোহাই, আমাকে এ দুর্দিনে তুমি সাহায্য করো। আমি কথা দিচ্ছি, কয়েকটা শো হলেই টাকা মানিঅর্ডার করে ফেরত পাঠাব। বিলিভ মি রাণু!

আমার কাছে অত টাকা নেই।

যা আছে দাও, তাই হেল্প। অ্যাই এম ফিনিশড রাণু। এবার আমাকে না খেয়ে মরতে হবে।

রাণু ফের দাঁড়াল। ঠোঁট কামড়ে ধরে ব্যাগ খুলল। একটা শাড়ি কিনবে বলে টাকা এনেছিল। হঠাৎ মনে হয়েছিল, কী দরকার অত শাড়ির? তাই কেনেনি। সে একশ টাকার নোটটা কাঁপা-কাঁপা হাতে তুলে রাজামিয়ার হাতে গুঁজে দিল।

রাজামিয়া টাকাটা ভেতর পকেটে ঢুকিয়ে একটু হাসল।···আমি জানতুম, তুমি বড় ভাল মেয়ে রাণু। কিন্তু আমি একটা শয়তান —একটা ইডিয়ট। আই মিনড ইট!

রাণু কাঁপা-কাঁপা স্বরে গর্জে উঠল, খুব হয়েছে! আপনি আসুন তো!

রাজামিয়া গ্রাহ্য করল না।··· একটু থাকি। তোমায় বাসে তুলে দিই। ওঃ! কতদিন পরে ফের তোমার সঙ্গে দেখা হল। আমি স্বপ্নেও ভাবিনি আবার তোমায় দেখব।

রাণু অন্যপাশে ঘুরে দাঁড়িয়ে রইল। বাসটা যেন খুব ধীরে এগিয়ে আসছে। স্টপে পৌঁছতে কি রাণুর চুল শাদা হয়ে যাবে—সে বুড়ি হয়ে যাবে? তার বুকের ভেতর একটা আবেগ দুলে উঠছিল। সে ঠোঁট কামড়ে ধরে নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করছিল।

কিছুক্ষণ পরে ট্রেনে আসতে আসতে রাণু নিজের ওপর যত অবাক হল, তত রাগ হল তার। সামান্য টাকা নয়, একশোটা টাকা—সে এক প্রতারকের কথায় ভুলে দিয়ে বসল! অভাবের সংসারে অতগুলো টাকা থাকলে কত কাজে লাগত!

এগারো

শীতে রাণুর বাগানে ডালিয়া ফুটল। চন্দ্রমল্লিকা ফুটল। ফুটল প্রিন্স অ্যালবার্ট বিশাল গোলাপ। স্কুল থেকে বিকেলে রাণু ফেরার সময় কোনো-কোনো দিন ডেকে নিয়ে আসে চৈতালীকে। কখনও ডেকে নিয়ে আসে তার প্রিয় ছাত্রীদের। ওরা ফুলের প্রশংসা করলে রাণুর মুখটা ফুলের মতো ফুটে ওঠে।

কোনো বিকেলে হাতে খুরপি আর মাটির গন্ধ নিয়ে রাণু তার বাগানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। গেটের দিকে দাদীবুড়ি কাঠ-মল্লিকার বুকের ভেতর হঠাৎ ডাকতে শুরু করে দিনশেষের ক্লান্ত একটা ঘুঘুপাখি। তার বুকটা ধড়াস করে ওঠে।

জলের ঝারি হাতে নিয়ে সে ডোবার ধারে যায়। বিন্দু-বিন্দু সবুজ দামে ঢাকা ডোবার চারধারে শীতের শুষ্কতা জেগে উঠছে। ওপাশে বিশীর্ণ বাঁশবনে হলুদ পাতাঝরার সর সর খর খর চাপা শব্দ। পেছনের অত ফুল, অত সজীবতা সামনের এক বিস্তীর্ণ রিক্ততার কাছে বড় অকারণ আর নিরর্থক লাগে।

সন্ধ্যায় 'সন্ধ্যানীড়ে' বিদ্যুতের আলো জ্বলে এখন। রাণুর চোখ জ্বলে যায়। ঘরে ঘন নীল শেডে ঢাকা টেবিলবাতি নীলরঙের আলো ছড়ায়। সুইচ অফ করে অন্ধকারে চুপচাপ বসে থাকে রাণু।

উঠোনে উজ্জ্বল আলোয় বসে আছেন মসজিদ-প্রত্যাগত মবিন কাজী। গলা ঝেড়ে বলেন, অ রাণু! সেই গানখানা বাজা না মা! শুনি।

নাজিম একটা রেকর্ডপ্লেয়ার কিনেছে। রাণুর ঘরেই থাকে সেটা। এই নিঃঝুম সন্ধ্যায় গানও তেতো লাগে রাণুর। বারান্দায় নিয়ে গিয়ে টুলের ওপর রেখে রেকর্ডটা চালিয়ে দেয় রাণু। ময়নার মা পা ছড়িয়ে বসে শোনে। প্লাগের দিকে আঙুল তুলে বুড়িকে হুঁশিয়ার করে রাণু। দেখো, সেদিনকার মতো সুইচে হাত দিও না। মারা যাবে বলে দিচ্ছি!

কাজীসায়েব ঘোষণা করেন, গরম পড়লে বুলিবা আসবে লিখছে। একটা টেপরেকর্ডার আনবে সঙ্গে করে। নাজুর বড় সখ।

অত সখ তো গেল না কেন নাজু? জোহরা রান্নাঘরের বারান্দায় চায়ের বাটিতে চুমুক দিয়ে বলেন। শাহাবুদ্দিন প্লেনের টিকিট পাঠাল। হারামজাদা ছেলের মতি বোঝা দায় বাপু! গেলে সেখানে সাহেবী হালে থাকত। গেল না!

নাজিম যায়নি আবুধাবি। রাণুকে আড়ালে একমুখ হাসি নিয়ে বলেছিল, লিখে দে আপা—এ নাজু যাবে না। এ নাজু একটা ঘা খেয়ে পালাবার ছেলে নয়। শালা! কত পীরতলার মাটি কাঁপিয়ে গাঁক গাঁক করে ট্রাক ছুটিয়ে বুনো মোষের মত বেড়াবে নাজু। আ বে! আমার হাতে স্টিয়ারিং—কাকে পরোয়া! তুই লিখে দে আপা, নাজু কোথাও যাবে না। আজ চললুম রামপুরহাট। সেখান থেকে সাঁইথে হয়ে কান্দি। কান্দি থেকে ছুটব বহরমপুর। আসার পথে পীরতলায় আওয়াজ দিয়ে আসব। আমার হাতে স্টিয়ারিং—তলায় চাকা। মারো চক্কর, লাগাও টক্কর!

নাজিম টলছিল। রাণু তাকে ঠেলতে ঠেলতে বের করে দিয়েছিল ঘর থেকে। বাবামায়ের সামনে নাজিম মাতাল অবস্থায় কদাচ যায় না। খিড়কি দিয়ে কেটে পড়েছিল।

রাণু জানে, আব্বা নাজিমের জন্য ভেতর-ভেতর মেয়ে দেখে বেড়াচ্ছেন। নাজিমের সায় নিশ্চয় আছে। রাণুর মনে হয়, নাজিম নিজের বিয়ে করার ইচ্ছে দিদির কাছে বলতে লজ্জা

পেয়েছে। অদ্ভুত ওর লজ্জা। প্রেমের কথা নিঃসঙ্কোচে বলতে পেরেছিল, বুকে মুখ গুঁজে বাচ্চা ছেলের মতো কাঁদতে পেরেছিল —অথচ এই স্বাভাবিক কথাটা বলতে পারেনি।

হয়তো ভেবেছে, তার দিদির বিয়ে হল না—নিজের বিয়ের কথাটা কোন্ মুখে বলবে? রাণু মনে-মনে বলে, বোকা ছেলে! রাণু তো ইচ্ছে করেই বিয়ে করল না। সে বুলির মত সুন্দরী নয় বলে যে তার বর জোটেনি, এমন তো নয়। কেন—ইসলামপুরের সেই অধ্যাপক ভদ্রলোক?

রাণুর ধারণা, এখনও যদি সে মোজাম্মেল হোসেনকে বিয়ে করতে চায়, মোজাম্মেল হোসেন তার বউকে তালাক দিতে দেরি করবে না।

এ ধারণা রাণুকে সুখী করে। কিন্তু পরক্ষণে সে লজ্জায় ক্ষোভে এতটুকু হয়ে যায় নিজের কাছে। ছি ছি! একথা সে কেন ভাবে? তার মতো একটি মেয়ে—হলই বা সে বিএ-তে ফেল করা মেয়ে, তাকে স্বামীর কাছ থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিতে চাইবে রাণু, এমন নিষ্ঠুর আর হ্যাংলা তো সে নয়। তার চেয়ে বড় কথা, মোজাম্মেলের সঙ্গে তার প্রেম-ট্রেমও তো হয়নি। টাকওয়ালা লোকটিকে বরং তার এত অপছন্দ যে দূর থেকে দেখলেই পালিয়ে যেতে চায়।

স্কুলের পাশে খাস জমিটা পাওয়া গেছে। শীতেই কাজ শুরু হয়ে গেছে। শিক্ষিকাদের এবং বাইরের ছাত্রীদের থাকার জন্য দোতালা হোস্টেল হবে। পাটোয়ারীজীর লক্ষ্য মেয়েদের কলেজ করা। কুতুবগঞ্জের ব্যবসায়ীদের সেধে বেড়াচ্ছেন সব সময়। রাজনীতিওয়ালাদের ধরাধরি করছেন। কুতুবগঞ্জের সব দলের লোকেই পাটোয়ারীজীকে শ্রদ্ধা করে।

ডিসেম্বরে পরীক্ষার মাসে স্কুলের পত্রিকাটা বেরুল না। জানুয়ারীতে বেরুবে। রাণুর ফাইলে লেখা জমে আছে। ক্লাস টেনের টেস্ট পরীক্ষাও হয়ে গেল। রাণু বড় ব্যস্ত। এসময়টা পরীক্ষার খাতা দেখতে হয় রাত জেগে। কোনদিকে মন দেবার

সময় নেই। জানুয়ারীতে মেয়েরা নতুন ক্লাসে উঠলে একটা ফাংশান হল। কৃতী ছাত্রীদের স্থানীয় ব্যবসায়ীরা পুরস্কার দিয়ে থাকেন। সেই ফাংশানে যথারীতি অধ্যাপক মোজাম্মেল হোসেন সস্ত্রীক হাজির।

রোদভরা দুপুরে প্রাঙ্গণে সামিয়ানা খাটানো হয়েছে। মেয়েরা মাইকের সামনে দল বেঁধে উদ্বোধন সঙ্গীত গাইছে। রাণু আজ একটু সেজেগুজে এসেছিল। উজ্জ্বল চাঁপারঙের সিল্কের শাড়ি; লাল লম্বা হাতা ব্লাউজ। কপালে লাল টিপ। গলায় লকেট-চেন। কানে মণিপুরী ঝুমকা। হাতে হাল্কা রুলিবালা। চৈতালী তার আলতো করে বাঁধা খোঁপায় ফুল গুঁজে দিয়েছিল একগোছা।

ডায়াস থেকে সে দেখল টাকওয়ালা অধ্যাপকের সঙ্গে এক যুবতী হেঁটে আসছে। রাণু নিষ্পলক চোখে চেয়ে রইল। ফর্সা রঙের স্বাস্থ্যবতী মেয়েটির বয়স চৈতালীর চেয়েও কম মনে হচ্ছিল। মুখে এখনও বালিকার আদল। চোখ জ্বলে গেল রাণুর।

যতক্ষণ ফাংশান চলল, রাণু নির্লজ্জের মতো তবু বারবার মোজাম্মেলের বউকে দেখতে থাকল। মোজাম্মেল চশমার ভেতর দিয়ে রাণুকে দেখছে কিনা রাণু বুঝতে পারছিল না। মোজাম্মেল কবিতা না পড়ে ছাড়বে না। সে ডায়াসে এলে রাণু মুখ টিপে হেসে না বলে পারল না—খুব লম্বা কবিতা নয় তো?

মোজাম্মেল কি শুনতে পেল না তার কথা? সভা চালাচ্ছেন মহিলা এস ডি ও। চাপা গলায় রাণুর উদ্দেশ্যে বললেন, আধুনিক কবিতা। লম্বা না হবারই চান্স!

রাণু এ রসিকতায় হাসতে পারল না। মোজাম্মেল কি তাকে দেখতে পেল না—তার কথাও কি কানে যায়নি ওর? নাকি ইচ্ছাকৃত অপমান করা। রাণু ডায়াস থেকে সরে এল।

ফাংশান বেশ লম্বাই হল। শেষ হতে চারটে বেজে গেছে। সন্ধ্যায় মেয়েরা 'ডাকঘর' নাটক করবে। নাটকের ব্যাপারটা বিদিশাদির হাতে। বাড়ি ফেরার আগে কী ভেবে রাণু বড়দির বাসায় গেল।

গিয়ে দেখে, লনে চেয়ার পেতে বড়দি আর মোজাম্মেল দম্পতি বসে গল্প করছে। জয়ন্তী তাকে দেখতে পেয়েছিলেন। তাই রাণুকে যেতে হল। জয়ন্তী বললেন, এস রাণু, মোজাম্মেলের বউয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। কী নাম যেন তোমার গো? ভুলে যাই।

মোজাম্মেলের বউ মৃদুস্বরে বলল, মানেকা! তারপর সে হাত কপালে ঠেকিয়ে রাণুকে আদাব দিল।

মোজাম্মেল সহাস্যে বলল, মানেকা বেগম বলো। আমি কিন্তু ডাকি মণিকা বলে।

রাণু একটু হাসল।·· তাহলে হিন্দুয়ানীর অপবাদ দেবার মত আরও লোক আছে পৃথিবীতে!

মোজাম্মেল গ্রাহ্য করল না কথাটা। ওর দিকে ঘুরে বলল, কেমন দেখছেন আমার বেগমসায়েবাকে?

রাণুব কান জ্বালা করে উঠল কথাটায়। তাকে কি ব্যঙ্গ করছে মোজাম্মেল? রাণু আস্তে বলল, ভালই তো।

মোজাম্মেল জয়ন্তীর দিকে তাকিয়ে বলল, বুঝলেন বড়দি? কানে সেই যে কী মন্ত্র ঢুকিয়ে দিলেন, সারাক্ষণ পাঠ্যবই নিয়ে লড়ে যাচ্ছে। জুলাইয়ে পরীক্ষায় বসবে। কাজেই আপনাদের ফাংশানে আসা যাবে না! আমি বললুম, বড়দির ফাংশানে না গেলে ভীষণ রাগ করবেন। তখন বই ফেলে উঠল।

মোজাম্মেল হাসল। বুদ্ধিমতী জয়ন্তী বললেন, রাণু কি চা-ফা খাবে এখন? এদের একবার সন্ত হয়েছে।

রাণু বলল, না। যাই বড়দি। বড্ড টায়ার্ড।

জয়ন্তী বললেন, হ্যাঁ, বিশ্রাম নাও গে। বাই দা বাই, ভুলেই গিয়েছিলুম, ওরা তো সন্ধ্যায় 'ডাকঘর' করবে। তোমাকে থাকতে হবে নাকি?

না। বিদিশাদির ডিপার্টমেন্ট ওটা। বলে রাণু উঠল।

খাবার সময় বলে যেও ওদের, আমায় যেন টাইমলি খবর পাঠায়।

জয়ন্তী ক্লান্তভাবে বললেন। কিছুক্ষণ গিয়ে না বসলে মেয়েরা দুঃখ পাবে। মোজাম্মেল, তোমরা যাবে না?

মোজাম্মেল বলল, নিশ্চয় যাব। বুঝলেন না? অজ পাড়াগাঁর মেয়ে। এসব কালচারাল ব্যাপারের সঙ্গে যোগাযোগের বিশেষ সুযোগই পায়নি। গ্রাম থেকে বাসে চেপে কোন রকমে বহরমপুরে কলেজ করতে যেত। কলেজ থেকে বেরিয়ে সোজা বাড়ি ফিরতে হত। মুসলিম ফ্যামিলির ব্যাপার তো বোঝেন। ধরাবাঁধা গণ্ডীর মধ্যে লাইফ। তার বাইরে পা বাড়াতে মানা। এর যে এতটুকু লেখাপড়া হয়েছিল, সেও আমার মামাশ্বশুরের জোরে। মামাশ্বশুরের পাটের ব্যবসা আছে। দেশের হালচাল বোঝেন। জেদ করে ভাগ্নীকে পড়াশুনো করিয়েছেন।

জয়ন্তী রাণুর দিকে চোখ নাচিয়ে রসিকতা করে বললেন, হ্যাঁ গো! মেয়ের বাপকে পথে বসাও নি তো?

মোজাম্মেল জিভ কেটে বলল, ছি ছি। সে কী কথা! জিগ্যেস করুন না। তাছাড়া আমাকে কি তেমন মনে হয় আপনার বড়দি?

মোজাম্মেলের অভিমান টের পেয়ে জয়ন্তী হেসে উঠলেন। স্বভাবসিদ্ধ ভংগীতে বললেন, জাস্ট এ জোক। বোঝো না কেন?

রাণু চলে আসতে আসতে রাগ করে ভাবল, উঠে দাঁড়িয়েও কেন অতক্ষণ বেহায়ার মতো কান পেতে মোজাম্মেলের কথা শুনছিল সে? নিজের আচরণে মাঝে মাঝে নিজের ওপর প্রচণ্ড ক্ষোভে ফেটে পড়ে রাণু। এখন সে নিজেকে চাবুক মারছিল।

বিদিশাদির কাছ হয়ে বড়দির কথাটা বলে যাবার কতক্ষণ পরও সে নিজেকে চাবুকে জর্জরিত করল। তাকে জয়ন্তীর মতো শক্ত আর নির্বিকার হতেই হবে।…

শীতের শেষে রাণুর বাগানে ডালিয়া-চন্দ্রমল্লিকা শুকিয়ে গেছে। এখন অন্য ফুলের মাস। হাস্নুহানা চাঁপা কামিনী টগরফুলের গাছে স্নেহে জল সিঞ্চন করে রাণু। বারোমেসে জবাফুলের গোড়ার মাটি

আলগা করে দেয়। গেটের দিক থেকে কাঠমল্লিকার গন্ধ ভেসে আসে। ছুটির দুপুরে ঘুঘুপাখি ডাকে। রাণুর বুকটা ধড়াস করে উঠে। লোকটা কি সত্যি উঠে দাঁড়াতে পেরেছে রাণুর টাকায়? ম্যাজিকের শো দেখিয়ে বেড়াচ্ছে গ্রাম-গঞ্জের পালাপার্বণে মেলায় —শহরের রাস্তায়-রাস্তায়?

বহরমপুর গেলে রাণু চারদিকে অনুসন্ধানী চোখে তাকায়। খালি মনে হয়, কখন খুব কাছেই ডেকে উঠবে এক অলীক ঘুঘুপাখি। কোনো বিশাল গাছের তলায় দাঁড়িয়ে কেউ মিটিমিটি হেসে বলে উঠবে, রাণু বেগম যে! কেমন আছ?

তখন রাণু খুব ভদ্রভাবে বলবে, আপনি ভাল আছেন তো? গলার অসুখটা সেরে গেছে তো?

তারপর রাণু ক্ষুব্ধ হয়। এ কী অদ্ভুত বোকামি তার? অতগুলো টাকা কী এক ঘোরে দিয়ে বসেছিল একটা জুয়াচোর, রাস্তার লোককে—মদ খেয়েই শেষ করেছে রাণুর রক্তজল করা টাকাগুলো! একশোটা টাকা!

শহরের পিচরাস্তায় ধুলোপাতা খড়কুটো উড়িয়ে যায় চৈতালী ঘূর্ণীহাওয়া। শিরিস আকাশিয়া মেহগনির উজ্জ্বল সবুজ পাতায় শন্ শন্ শব্দ উঠে। স্টেশনের বাসের অপেক্ষায় রাণু দাঁড়িয়ে থাকে স্টপে। বাসে চাপার মুহূর্ত অব্দি সে কান পেতে থাকে, যদি কেউ তার নাম ধরে নিঃসঙ্কোচে ডেকে ওঠে!

এপ্রিলে যে কোনও দিন বুলিরা আসছে। বাড়িতে বাবা-মা সারাক্ষণ তাদের কথা বলছেন। জামাই-মেয়ে কী খাবে, কী খেতে ভালবাসে, তাই নিয়ে জোহরা ময়নার মায়ের সঙ্গে রসিকতা করছেন। এ তো চাষাভূষা জামাই নয়, পাকা সায়েব লোক। বড় ইঞ্জিনিয়ার। সেখানে টয়টো গাড়ি হাঁকিয়ে ঘোরে। জোহরা স্বামীর কাছে শুনে-শুনে গাড়ির নামটা মুখস্থ করে ফেলেছেন।

রাণু ভাবে, বুলি পয়লা বোশেখের আগে এসে পড়লে ভাল হয়। পয়লা বোশেখ নেতাজী ক্লাবের ছেলেরা ফাংশান করে। রাণুকে

ডাকতে আসবে ওরা। বুলি থাকলে গান গাইবে নববর্ষের উৎসবে।

স্কুল থেকে বিকেলে ফিরে রাণু তার বাগানে মাটি খুঁড়ছিল। ময়নার মা গোবরসার বয়ে আনছে সার-গাদা থেকে। পপি আর প্যান্সির বীজ এনে রেখেছে রাণু। মাটিটা জিয়োলে বীজ ছড়াবে। খুরপি দিয়ে মাটি গুঁড়ো করছিল। নার্সারির লোকটি বুঝিয়ে দিয়েছে মাটির অবস্থাটা কেমন দাঁড়াবে। বলেছে, এ হল দিদি আর্টিস্টের কাজ। খুব রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে সিড-বেড তৈরী করতে হয়। সাবধান দিদি, যেন জমাট কাদা করে ফেলবেন না।

গেটের দিক থেকে অবেলায় নাজিম এসে ডাকল, আপা! কী করছিস রে?

রাণু মুখ তুলে মিষ্টি হেসে বলল, আয়। এক দারুণ ব্যাপার করছি। বুলি আর তুলামিয়ার চোখ জ্বলে যাবে। বুঝলি নাজু? এক সপ্তাহের মধ্যে ফুল ফোটায়—গাছ কয়েকইঞ্চি বাড়তে না-বাড়তেই।

নাজিম বাগানে ঢুকে ঘাসের ওপর বসে পড়ল।

রাণু বলল, কী হয়েছে রে? তোকে অমন দেখাচ্ছে কেন?

নাজিম থুথু ফেলে বলল, ধুস্ শালা! মনটা খারাপ হয়ে গেল আজ। জানিস? বহরমপুরে গিয়েছিলুম গাড়ি নিয়ে। কোর্টের কাছে ভিড় দেখে গাড়ি থামালুম। দেখি শালা রাজামিয়া মরে পড়ে আছে। ধড়টা উপুড় হয়ে আছে, মুখটা কাত। দিলে মেজাজটা খারাপ করে। হোটেলে ভাত রুচলনা মুখে।

রাণু নিষ্পলক তাকিয়ে শুনছিল। মুখটা নামাল। তার হাত থেমে গেল। খুরপিটা মাটির বুক আঁকড়ে ধরল। মরে গেছে রাজামিয়া? একশো টাকা দিয়েও তাকে বাঁচিয়ে রাখা গেল না তাহলে? কোনো কাজে লাগল না রাণুর রক্তজল করা টাকাগুলো!

নাজিম বলল, লোকটা হারামী হতে পারে, খুব গুণী ছিল রে আপা! তুই তো দেখেছিস। বড় ঘরের ছেলে ছিল। অমন নবাবজাদার মতো ঝলমলে চেহারা! বুদ্ধির দোষে এভাবে রাস্তা

ঘাটে মরে গেল। আপা, আমার কেন পস্তানি হচ্ছে জানিস? ওকে খামোকা পরের কথায় মারধর করেছিলুম। খুব গোনা (পাপ) হয়ে গেছে রে! সেজন্যই মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল।

নাজিম আবার থুথু ফেলে উঠে গেল। বাড়ির ভেতর সে চড়া গলায় মাকে খবরটা দিচ্ছিল। তখনও রাণু বসে আছে। দিনশেষের ধূসরতা ঘনিয়েছে তার বাগানে। খুরপিটা মাটির বুক আঁকড়ে ধরে আছে।

ময়নার মা সারের ঝুড়ি এনে ডাকলে রাণু হাত বাড়িয়ে বলল, কে, দাও।···

শেষ